সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০১৪

প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতি

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র

তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ
মাছুমা বিল্লাহ

সংকলন ও সম্পাদনা
সাকেরা নাহার
মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন

সমন্বয়কারী টীম
এলিসন সুব্রত বাড়ৈ
মো. শরিফুল ইসলাম
দিল আফরোজ দ্যুতি
মো. আরিফুল ইসলাম
কৃতি বিজয় চাকমা

প্রকাশকাল
মার্চ ২০১৫

আঙ্গিক, প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
মোবা: ০১৭১৮৩০৩৮৩৪

প্রকাশক
সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র
৮/১৯, স্যার সৈয়দ রোড (৬ষ্ঠ তলা)
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৯১৮৫০০১ ফ্যাক্স: ৯১৩৯৭৯০
ই-মেইল: info@supro.org
ওয়েবসাইট: www.supro.org

কমিউনিটি গবেষক
নাজমুন নাহার সুইটি
বেগম রোকেয়া
ডেইজি আহমেদ
আহমেদ স্বপন মাহমুদ
মো. শহিদুল ইসলাম
মাধব চন্দ্র দত্ত
এম এ ছালাম
কেজীএম ফারুক
হোসনে আরা হাসি
মো. মাহবুব মোর্শেদ
মঞ্জু রাণী প্রামাণিক
শামিমা আক্তার মুনমুন
ললিত সি চাকমা
শরীফা খাতুন
মতিউর রহমান
আজিজুর রহমান
সৈয়দা হাবিবা
নুরুল আলম মাসুদ
জাহিদুল ইসলাম
মো. মাহবুবুর রহমান
নির্মল ভট্টাচার্য
সায্যাদ আনসারী
এএইচএম শামসুল ইসলাম দিপু
পারভীন হালিম
প্রফুল্ল কুমার রায়
দেবজ্যোতি রায় জনি
মো. রাজু আহমেদ
গোলাম রহমান কোরাইশী সজল
মো. তৌহিদ মুরাদ
ফারুক রহমান
দেলোয়ার হোসেন
সাকিনা আক্তার সাকী
মো. মামুন মিয়া
সালমা আক্তার চৈতি
মো. হুমায়ুন কবীর চৌধুরী
এজাজ আহমেদ
সুনেন্টু চাকমা
রাফেজা পারভীন
মো. মোকার্‌রম হোসেন মানিক
মোছা. তাহেরা খাতুন
অঞ্জন কৃষ্ণ শীল শুভ
আসাদুজ্জামান চৌধুরী কাজল
দারুল ইসলাম
সৈকত দত্ত
আশীষ কুমার দাশ
ফারুক আহমেদ
সৈয়দা আফিফা (তানিয়া)
মুহাম্মদ মিজান উদ্দিন

মুখবন্ধ

'সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান'–সুপ্র তৃণমূল পর্যায়ের ৬ শতাধিক বেসরকারি সংস্থা ও নাগরিক সংগঠনগুলোর একটি জোট। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সুপ্র জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ইস্যুতে জনমত সংগঠিত করাসহ নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দেশের ৪৫ টি জেলায় কর্মরত 'সুপ্র'র সদস্য সংগঠন ও প্রতিনিধিবৃন্দ জাতীয় নীতি-কৌশল প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধনে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নিরন্তর প্রচারাভিযান ও অধিপরামর্শ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। 'সুপ্র' চায় এমন একটি ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক সমাজ যেখানে প্রতিটি মানুষ তাদের স্ব-অধিকারের নিরীখে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল সুবিধা সমানভাবে ভোগ করবে এবং সমানভাবে বিকশিত হবে।

সমাজে অধিকার আদায় এবং স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার সংস্কৃতি সৃষ্টির লক্ষ্যে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারি যেসব সেবাসমূহ জনগণের পাওয়ার কথা সেগুলো সঠিকভাবে পাচ্ছে কিনা, পেলে সেগুলোর গুণগত মান কেমন, প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান–সুপ্র ২০১০ সাল থেকে সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে বাংলাদেশের ২৪ টি জেলায় সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

নিরীক্ষা কার্যক্রমের ফলাফল নিয়ে সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০১৪ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। অনেকের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে কাজটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সুপ্র'র সম্মানিত নির্বাহী বোর্ড ও জাতীয় পরিষদ সদস্যসহ জেলা সম্পাদকবৃন্দকে, যাদের সার্বক্ষণিক তদারকিতে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ এবং জেলাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জেলা কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দের প্রতি যারা এই নিরীক্ষা কাজটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে সহায়তা করেছেন। মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং জেলা প্রতিবেদন প্রণয়নে সুপ্রর জেলা ক্যাম্পেইন সহায়কগণ প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা শত ব্যস্ততার মাঝেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, অভিভাবক, শিক্ষার্থী, আন্তঃবিভাগ ও বহিঃবিভাগের রোগীদের প্রতি যাদের সহযোগিতা ছাড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্ভবই হতো না। শুধু তাই নয় জাতীয় পর্যায়ে মতবিনিময় সভায় সেসকল সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তাব্যক্তিগণ এবং নাগরিক প্রতিনিধি ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত থেকে এবং মতামত প্রদান করে প্রতিবেদনটিকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন, ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদেরকেও।

সুপ্র জাতীয় পরিষদ সদস্য, জেলা সম্পাদক, জেলা প্রচারাভিযান সহায়ক ও সচিবালয়ের পরিচালকসহ সকল কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যারা প্রতিবেদনের ধারনাপত্র ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন, সম্পাদনা ও সমন্বয়ের কাজে সহায়তা প্রদান করেছেন। সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০১৪ প্রকাশের কাজটি আমরা অতি যত্ন সহকারে করার চেষ্টা করেছি। এরপরও ভুলত্রুটি থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এক্ষেত্রে আপনাদের সকলের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

ধন্যবাদসহ

আহমেদ স্বপন মাহমুদ
চেয়ারপার্সন, সুপ্র

মো. আরিফুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক, সুপ্র

সামাজিক নিরীক্ষা
প্রতিবেদন ২০১৪
প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতি

সূচিপত্র

১. সামাজিক নিরীক্ষা ০৬
১ প্রেক্ষাপট ০৬
২ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিত ০৭
৩ প্রাথমিক শিক্ষা পরিপ্রেক্ষিত ০৮
৪ সামাজিক নিরীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ০৯
৫ নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত ভৌগোলিক এলাকা ১০
৬ সামাজিক নিরীক্ষার পদ্ধতি ১০
৭ উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ১০
৮ সামাজিক নিরীক্ষা কাজের সীমাবদ্ধতাসমুহ বা চ্যালেঞ্জ ১০

২. সামাজিক নিরীক্ষা : শিক্ষা ১১
১ গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি ১১
২ গবেষণার এলাকা ১১
৩ নিরীক্ষার পরিধি ১১
৪ যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ১১
৫ বই বিতরণ ও অভিযোগ ১২
৬ পাঠদান ১২
৭ কোচিং ১৩
৮ শিক্ষার মানোন্নয়নে উপবৃত্তির ভূমিকা ১৪
৯ ফিডিং প্রোগ্রাম ১৫
১০ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধাসমূহ ১৫
১১ স্কুলের উপরিকাঠামো ১৬
১২ স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ১৮
১৩ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ১৮
১৪ ঝরে পড়া এবং বাঁধা ১৯
১৫ শারীরিক শাস্তি ১৯
১৬ কেস স্টাডি - ১ ২০
১৭ কেস স্টাডি - ২ ২১
১৮ ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত ২১
১৮ সুপারিশ ২২

৩. সামাজিক নিরীক্ষা : স্বাস্থ্য ২৩
৩.১ গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি ২৩
৩.২ সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমভুক্ত এলাকা ২৩
৩.৩ তথ্য সংগ্রহের পরিধি ২৩
৩.৪ যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে ২৩
৩.৫ কমিউনিটি ক্লিনিক ২৪
৫.১ সেবাদাতা-হেল্‌থ কমিউনিটি ক্লিনিক ২৪
৫.২ সেবার ধরণ ২৪
৫.৩ সেবা প্রাপ্তিতে বাঁধা ২৫
৫.৪ রোগীদের অন্যত্র রেফার করা ২৫
৫.৫ স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন ও তদারকি ২৬

৫.৬ মাসিক প্রতিবেদন ২৬
৫.৭ কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি ২৭
৫.৮ মানসম্মত সেবা প্রদানে চাহিদা ২৭
৫.৯ কমিউনিটি ক্লিনিক ম্যানেজমেন্ট কমিটি সদস্য ২৮
৫.১০ সভা ও তদারকি ২৮
৫.১১ সেবার ধরণ ও প্রেসক্রিপশন ২৮
৫.১২ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ২৯
৫.১৩ স্থানীয় জনগণের সাথে এফজিডি ২৯
৩.৬ ইউনিয়ন পর্যায় ৩০
৬.১ সেবা দাতা ৩০
৬.২ সেবার ধরণ ৩০
৬.৩ রোগীদের অন্যত্র রেফার করা ৩০
৬.৪ স্বাস্থ্য সেবার মান ৩১
৬.৫ সেবা কেন্দ্রের মানোন্নয়নে সুপারিশ ৩১
৬.৬ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী ৩২
৬.৭ যে সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে সেবা নেয়া হয় ৩২
৬.৮ স্বাস্থ্য কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য ৩২
৬.৯ সেবার ধরণ ৩৩
৬.১০ সেবা প্রাপ্তিতে বাঁধা ৩৩
৬.১১ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিবেশ ৩৩
৬.১২ স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে পরামর্শ ৩৪
৬.১৩ স্থানীয় জনগণ ৩৪
৬.১৪ স্বাস্থ্য কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য ৩৪
৬.১৫ সেবার ধরণ ৩৪
৬.১৬ ম্যানেজমেন্ট কমিটি ৩৫
১৬.১৭ ম্যানেজমেন্ট কমিটির পরামর্শ ৩৫
৩.৭ উপজেলা পর্যায় ৩৬
৭.১ হেল্‌থ টেকনিশিয়ান ৩৬
৭.২ সেবার ধরণ ৩৬
৭.৩ ঔষধের তালিকা ৩৭
৭.৪ অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ৩৭
৭.৫ সিভিল সার্জন, আর.এম.ও এবং এম.ও ৩৭
৭.৬ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী ৩৭
৭.৭ স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য ৩৮
৭.৮ প্রেসক্রিপশন ও ঔষধ ৩৮
৭.৯ অতিরিক্ত অর্থ প্রদান ৩৯
৭.১০ প্যাথলজি পরীক্ষা ৩৯
৭.১১ ডাক্তার ও নার্স সম্পর্কিত তথ্য ৩৯
৭.১২ অবকাঠামো ৩৯
৭.১৩ যন্ত্রপাতি ৪০
৭.১৪ কর্তব্যরত ডাক্তারদের তালিকা ও সিটিজেন চার্টার ৪০

সামাজিক নিরীক্ষা

সামাজিক নিরীক্ষা একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যার মধ্য দিয়ে অধিকার বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রাপ্তি সম্পর্কিত দৈণ্যতার স্পষ্ট উপস্থাপনা এবং সেই সাথে অধিকার সম্পর্কে তাদের সত্যিকার অবস্থানটা তুলে ধরা যায়। সামাজিক নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো অত্যাবশ্যকীয় সেবাখাত সমূহের এবং এর সাথে সম্পর্কিত সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জনগণের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং সেবার ক্ষেত্রে মাত্রার তারতম্য কতটা ঘটছে তা বৈজ্ঞানিক উপায়ে তুলে ধরা সম্ভব এই নিরীক্ষার মাধ্যমে। তাছাড়া এধরনের গবেষণায় জনগণকে সম্পৃক্তকরণের মধ্য দিয়ে সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি গঠন করা যায়, যেখানে স্থানীয় জনগণই নিজেরাই নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত এবং সে অনুযায়ী সমাধানের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন তুলে ধরতে পারে।

একটি গনতান্ত্রিক দেশে নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে তৃণমুল মানুষের চাহিদা সঠিক ভাবে প্রতিফলিত হওয়াই সে দেশের সুশাসন নিশ্চিত করে । কিন্তু অনেক সময়ই নানা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতার কারনে তৃণমূল মানুষের চাহিদা সঠিক ভাবে প্রতিফলিত হয় না এবং রাষ্ট্রীয় নীতি-নিয়ম হয়ে পরে একপেশে। সামাজিক নিরীক্ষা এমন একটা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যার মাধ্যমে সেবা গ্রহণকারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি সেবার পর্যাপ্ততা, মান, দূর্বলতা এবং সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণের সমন্বিত মতামত জানাতে পারে। এর মাধ্যমে জরিপ কার্যক্রমে সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা যায় এবং তৃনমূল মানুষের বক্তব্যও তুলে ধরা সম্ভব হয়। সামাজিক নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অধিকারবঞ্চিত মানুষ অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হতে পারে।

প্রেক্ষাপট:

একটি দেশের উন্নয়নের সাথে জড়িত মূল দু'টি বিষয় হলো শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। আর এজন্য উল্লেখিত বিষয় দু'টিকে সাংবিধানিকভাবে ও আন্তর্জাতিকভাবে মানুষের সার্বিক সক্ষমতার জন্য অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দেয়া হয়েছে। মানব উন্নয়নের সূচক হিসেবে অত্যাবশ্যকীয় এ খাত দুটোর বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকার অগ্রাধিকারের কথা বলে থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন করা যায়: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা....."। একথা অনস্বীকার্য যে, স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ মানবাধিকার এবং সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত মানব উন্নয়নের সূচক। সংবিধানের ১৮ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে"। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাস্তব পরিস্থিতিতে দরিদ্র-প্রান্তিক জনগণ এখনো শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিরাজমান নানা সমস্যার ফলে দরিদ্র-প্রান্তিক এবং তৃণমূলের জনগণ সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে মোট বরাদ্দ যথাক্রমে ৩২,৭৮০ কোটি টাকা যা মোট জিডিপির ২.৪৩ শতাংশ এবং ১১,১৭৬ কোটি টাকা কোটি টাকা যা মোট জিডিপির ০.৮২ শতাংশ। আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে একটি দেশের উন্নয়নের জন্য জিডিপির কমপক্ষে ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে এবং জিডিপির ৫ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ থাকা দরকার হলেও আমাদের জাতীয় বাজেট বরাদ্দে কোনও বছরই শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ যথাক্রমে জিডিপির ২ শতাংশ এবং স্বাস্থ্যখাতে ১ শতাংশ এর বেশি বরাদ্দ দেয়া হয় না। অন্যদিকে, অপ্রতুল এই বাজেট কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণীত হয় বলে এখানে অঞ্চলভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক চাহিদাগুলোকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না বলে বাজেটের সুষম বণ্টনও হয় না।

বিভিন্ন খাতের বাজেট বরাদ্দ তুলনা করলে দেখা যায় যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণখাতে বাজেট বরাদ্দ প্রতি বছরই কমেছে। এতে করে সামাজিক নিরাপত্তাখাতের সুবিধাভোগীর সংখ্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে

কমে যাচ্ছে আশংকাজনক হারে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সুপারিশে কৃষিখাতসহ অত্যাবশ্যকীয় সেবাখাতের ভর্তুকি হ্রাস করা হচ্ছে যা সাধারণ এবং তৃণমূল জনসাধারণকে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

অন্যদিকে দ্রুত নগরায়ন এবং পরিকল্পনাহীন নগরায়নের প্রভাব পড়ছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মত অত্যাবশ্যকীয় খাতসমূহে। বাংলাদেশের বিদ্যমান স্বাস্থ্যব্যবস্থা এমনকি শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকাংশেই শহর কেন্দ্রীক। প্রান্তিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যব্যবস্থা খুব প্রাথমিক পর্যায়ে উপস্থিত থাকলেও, যে কোন প্রকার জটিল পরিস্থিতি তথা উন্নত সেবার জন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে শহরমুখী হতে হয় যা অত্যন্ত ব্যয় বহুল। অন্যদিকে শিক্ষা মৌলিক অধিকার, শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড; এগুলো সর্বজনবিদিত। তথাপি শিক্ষা সেবার মান সমগ্র দেশে বর্তমান থাকলেও শহর এবং গ্রামাঞ্চল ভেদে শিক্ষার মানের বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা সেবার মানের তারতম্য অনুসারে শিক্ষা ব্যয়ও উঠা নামা করে। ব্যয়বহুল মানসম্মত শিক্ষা থেকে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বঞ্চিত বা মানসম্মত শিক্ষা ব্যয়বহুল বিধায় তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আওতার বাইরে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিত

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টা ও অর্জন উভয়ই প্রশংসনীয়। এরই প্রেক্ষিতে বিগত ২০১১ সালে বর্তমান সরকার রূপকল্প (ভিশন ২০২১) নির্ধারন করেছে। এই রূপকল্পে ২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দৈনিক নূন্যতম ২১২২ কিলো ক্যালরির উর্ধ্বে খাদ্যের সংস্থান, সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি সম্পূর্ন নির্মূলকরণ, সকলের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ, ২০২১ সালের মধ্যে গড় আয়ুস্কাল ৭০ এর কোঠায় উন্নীতকরণ, শিশু মৃত্যুর হার বর্তমান হাজারে ৫৪ থেকে ক্রমান্বয়ে ১৫ তে হ্রাসকরণ, মাতৃমৃত্যুর হার ৩.৮ থেকে ১.৫ শতাংশে হ্রাসকরণ এবং ২০২১ সালে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারের হার শতকরা ৮০ শতাংশে উন্নীতকরণে সরকার পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের মধ্যে প্রায় ১৬ কোটি লোক বসবাস করে। ঘনবসতির দিক থেকে যা অত্যন্ত বেশি। মোট জনগোষ্ঠীর ৩৩.১% এর বয়স ১৫ বছরের নীচে; প্রতি বছর দেশে প্রায় ২০ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহন করছে যা দেশের খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্ম সংস্থানের উপর বাড়তি চাপ এবং প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। তবে সঠিক নীতি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিগত বছরগুলোতে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এ সংক্রান্ত জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে এ কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

বর্তমানে দেশে সরকারি ও বেসরকারিখাতে যে স্বাস্থ্যসেবা জনগন পাচ্ছেন তা গুনগত মান ও পরিসরের দিক থেকে আরও উন্নত করা প্রয়োজন। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার জন্য উচ্চ ফি এবং অধিক রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষাকে ব্যয়বহুল চিকিৎসার একটি বড় কারন হিসেবে গন্য করা হয়। বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবার ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়েও জনগন সন্তুষ্ট নয়। জনবলের স্বল্পতা, যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষনের দুর্বলতা, অপর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে সরকারি স্বাস্থ্য সেবাকে দরিদ্র, দূরবর্তী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নিকট পৌছানো যাচ্ছেনা।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সেবা জনবলের ক্ষেত্রে সংকটাপন্ন ৫৭ টি দেশের একটি দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে চিহ্নিত। ডাক্তার ও নার্সের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত অনুপাত যেখানে ১ঃ৩ সেখানে আমাদের দেশে সে আনুপাত ১:০.৪৮ যা কোন ভাবেই আকাঙ্খিত নয়। ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য জনশক্তির স্বীকৃত অনুপাত ১ঃ৩ঃ৫ হলেও আমাদের দেশে চিত্র তার সম্পূর্ণ ভিন্ন।
দেশে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন স্থানীয় উদ্যোক্তা, বেসরকারি সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা পরিচালিত হয়ে থাকে। কেন্দ্র থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে চারটি অধিদপ্তর যথা-

ক. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
খ. পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর
গ. সেবিকা সেবা অধিদপ্তর
ঘ. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

এ কথা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যখাতে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। দেশের সকল মানুষ, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী যাতে উপকৃত হয়, সে লক্ষ্যে সরকার জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করেছে। সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন নীতিতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যাখাতে মূল লক্ষ্য হল- স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জনগণের উন্নতি সাধন। যাতে করে সমাজের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অংশ অর্থাৎ নারী, শিশু, প্রবীণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি এবং শারীরিক, সামাজিক, মানসিক কল্যাণ সাধিত হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রলায়ের অধীনে সরকার প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি এবং জাতীয় জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। বেসরকারি সংস্থাসমূহ শহর ও গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যাখাতে উল্লেখযোগ্য কাজ করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে থাকে। সম্প্রতি এসব সংস্থা তাদের সেবার পরিধি বিস্তৃত করেছে এবং শহরাঞ্চলেও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দিচ্ছে। দেশে স্বাস্থ্যখাতের একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হল জাতীয় ঔষধ নীতি। ১৯৮২ সাল থেকে কার্যকর হওয়া এই নীতির কাজ হল বাজার থেকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় ঔষধ অপসারণ করে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঔষধের ন্যায্যমূল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এই নীতির ফলে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্প বিকাশ লাভ করেছে। এই নীতি সংশ্লিষ্ট বিভাগকে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামোও দিয়ে থাকে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কয়েকটি সূচকে উন্নতি প্রয়োজন। এগুলো হল জন্মহার হ্রাস, অনূর্ধ ৫ বছর বয়সীদের মৃত্যু হার হ্রাস, মা ও শিশুদের টিকাদান, ভিটামিন-এ স্বল্পতা দূরীকরণ ইত্যাদি। এ লক্ষ্যে নানা রকম কর্মসূচী ও কার্যক্রম চালু রয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বর্তমানে ৫ বছর (২০১১-১৬ সাল) মেয়াদী একটি উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচীর নাম "স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১১-১৬"। ইংরেজীতে "HPNSDP ২০১১-১৬", মোট ৩২টি অপারেশনাল প্লানের মাধ্যমে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে। এই কর্মসূচীর জন্য রয়েছে একটি কৌশল পত্র এবং এবং একটি কর্মসূচী বাস্তবায়ন পরিকল্পনা। এ ছাড়াও স্বাস্থ্যসেবার পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকারি ও বেসরকারিখাতে অর্থের সংকুলান ও ব্যবস্থাপনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমাদের স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ গত এক দশক ধরেই জি.ডি.পি-র গড়ে মাত্র ০১% এর কম এবং এ বরাদ্দ উন্নয়নশীল দেশের তুলনায়ও কম।

প্রাথমিক শিক্ষা পরিপ্রেক্ষিত

শিক্ষা সকলের অধিকার, সুযোগ নয়। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্য পূরণে শিক্ষাই হচ্ছে প্রধান অবলম্বন। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা-চেতনায় প্রাগ্রসর একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌছে দিতে পারে। তাই শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড বলা হয়।

আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থায় রয়েছে ধারা। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত চারটি ধারায় শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। সেগুলো হলো–

- সাধারণ শিক্ষা
- ইংরেজি মাধ্যম
- মাদ্রাসা শিক্ষা
- ক্যাডেট শিক্ষা

সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখা ইত্যাদি। ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো হলো কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম ব্রিটিশ কারিকুলাম ও এনসিটিবি কারিকুলাম ইত্যাদি। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো হলো আলিয়া মাদ্রাসা, কওমী মাদ্রাসা ইত্যাদি। সুক্ষভাবে দেখলে আমরা বুঝতে পারি মূলত আর্থিক দিক থেকেই এই ভাগগুলো করা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত বেশি বেতনের স্কুলগুলোতে ভালো মানের শিক্ষাপ্রাপ্তি ঘটে। সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনা করলে এক হাজার ৯৪৩টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা উচিত ছিল। বিশেষত চর, সীমান্ত, হাওর, বাঁওড় ও পাহাড়ি এলাকা এক্ষেত্রে পিছিয়ে। সরকারি হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরিচালিত ২০১১ সালের সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী ২০০৭ সালে

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিশুদের ঝরে পড়ার হার ছিল ৫০.৫ শতাংশ, ২০০৮ সালে ৪৯.৩ শতাংশ এবং ২০০৯ সালে ৪৫.১ শতাংশ। ২০১০ সালে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে ঝরে পড়ার হার ৩৯.৮ শতাংশ। এ ছাড়া ঢাকাসহ শহরগুলোর বস্তিতে নগরবাসীর অন্তত ৪০% গরীব মানুষ বাস করে। তাদের অধিকাংশ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত। ৭ থেকে ১৪ বছরের ১ কোটি ৫০ লক্ষ শিশু স্কুলে না গিয়ে পরিবারকে সাহায্য করতে শ্রমে নিয়োজিত।

অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে বহুবিধ সমস্যা যার মধ্যে অন্যতম হলো– পর্যাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব, বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের অপ্রতুলতা, বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আর্থিক বৈষম্য, বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার অভাব, গ্রাম শহরের বৈষম্য, বেতন ফি বাবদ ব্যয় নির্বাহ করতে না পেরে ব্যাপক অংশের ঝরে পড়া, বিদ্যালয়ে শিক্ষার আনন্দদায়ক পরিবেশের অভাব, পঠন পাঠনে নোটবই নির্ভরতা ইত্যাদি। এ সমস্যাগুলো বেশি বেতনের স্কুল থেকে কম বেতনের স্কুল ও শহর থেকে গ্রামের দিকের স্কুলে পর্যায়ক্রমে বেশি।

একটি প্রতিযোগিতার আগে সকল প্রতিযোগীর জন্য সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। স্কুলগুলোর ভৌত কাঠামো সুযোগ সুবিধা, শিক্ষকের মান, ছাত্র বেতন ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলোতে প্রচন্ড বৈষম্য বিদ্যমান। যেমন, ক্যাডেট কলেজের একজন ছাত্রের জন্য সরকারের বার্ষিক ব্যয় প্রায় ৭৪ হাজার টাকা আর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র প্রতি বছরে ব্যয় হয় সর্বোচ্চ ২ হাজার টাকা।

প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ এখন পর্যন্ত সীমিত। অতিদরিদ্র পরিবারের শিশু প্রতিবন্ধী, দলিত সম্প্রদায় ও যৌনকর্মীদের শিশু এবং প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী শিশুদের ঝড়ে পড়ার হার বেশি। হাওর অঞ্চলের শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়াই কঠিন। এছাড়া আদিবাসি জনগোষ্ঠীর শিশুরা দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ভাষাগত সমস্যার কারণে শেষ পর্যন্ত বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে যায়।

আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে মানুষ তৈরীর কারিগর এই শিক্ষকদের মূল্যায়নে উদাসীনতা। শিক্ষকদের বেতন-ভাতার পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ায় এ পেশায় মেধাবীদের আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না এবং একই কারণে যারা শিক্ষকতা করেন তাঁরা প্রাইভেট টিউশনির দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হোন। এছাড়া শিক্ষকদের মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও নেই। কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে বর্ধিত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রাথমিক স্কুলগুলোকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বর্ধিত করা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ, উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে প্রাথমিক শাখা চালু করার ব্যবস্থা, প্রধান শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরুপণ ইত্যাদি বিষয়ে কোনোরকম অগ্রগতি নেই বললেই চলে।

সামাজিক নিরীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই জরিপের মাধ্যমে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে যে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাখাতে যে সকল সেবা, সুযোগ এবং প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে, তার কতটুকু জনগনের কাছে পৌছে, সীমাবদ্ধতা এবং বাঁধাগুলো কোথায় এ সংক্রান্ত তথ্য সমূহ। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, দরিদ্র-বঞ্চিত জনগণের জনসেবা প্রাপ্তি, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর সেবার মান বৃদ্ধি ও দরিদ্রবান্ধব সেবা প্রতিষ্ঠানে উন্নীতকরণে নীতি-কৌশল প্রণয়নে সুপারিশমালা তৈরি এবং এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সুপ্র ২০০১ সাল থেকে সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, যার মূল উদ্দেশ্য হল-

ক. সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরাজমান সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;
খ. দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তৈরি করা;
গ. প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে এলাকার জনগণের মধ্যে সচেতনতা এবং জনমত তৈরি করা;
ঘ. সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা ও কর্মমান নিরূপণ করা;
ঙ. সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মমান উন্নীতকরণে অধিপরামর্শ (Advocacy) করা।

নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত ভৌগোলিক এলাকা

এই সামাজিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাজটি করতে গিয়ে সুপ্র তার নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত ৪৫ টি জেলা হতে গুরুত্ব বিবেচনা করে ২৪ টি জেলা নির্বাচিত করেছে। নিরীক্ষার আওতাভূক্ত জেলাগুলো হলো-নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, নাটোর, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম, বরিশাল, বরগুনা, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শরীয়তপুর, সুনামগঞ্জ, জামালপুর এবং রাজবাড়ী। সময় ও জনবল বিবেচনায় ১২ জেলার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নিরীক্ষায় উপজেলা পর্যায় থেকে ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন পর্যায় থেকে ১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ২ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্বাচন করা হয়েছে। একইভাবে ১২ জেলার শিক্ষা সম্পর্কিত নিরীক্ষাভুক্ত কর্মএলাকার জেলা পর্যায় থেকে জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা পর্যায়ের ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সদর এলাকা, সদর এলাকার নিকটবর্তী বিদ্যালয় এবং প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যালয় বিবেচনা করা হয়েছে।

সামাজিক নিরীক্ষার পদ্ধতি

প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য রিপোর্ট কার্ড জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। রিপোর্ট কার্ড জরিপ একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যার মাধ্যমে সরকারের যে সমস্ত সেবাসমূহ জনগণের পাওয়ার কথা ছিল সেগুলো সঠিকভাবে পেয়েছে কি-না, পেলে সেগুলোর গুণগত মান কেমন ছিল, যে সময় পাওয়ার কথা ছিল তা এবং প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা যাচাই করা ইত্যাদি বিষয়গুলি এই জরিপের মাধ্যমে জানা যায়। এছাড়া রিপোর্ট কার্ড জরিপে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্যের সমন্বয় থাকে বলে সামাজিক নিরীক্ষার জন্য এটি অনেক বেশি যৌক্তিক, নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিবেচনা করে সুপ্র প্রাথমিক শিক্ষা এবং সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর সামাজিক নিরীক্ষায় এই পদ্ধতি অনুসরণ করে নিরীক্ষা কাজ পরিচালনা করেছে। রিপোর্টকার্ড জরিপ পদ্ধতিতে অনুসৃত কৌশলসমূহ হলো:

ক. সাক্ষাতকার (Semi-structure questionnaire)
খ. এফজিডি
গ. কেইস স্টোরি

মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে মূলত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, জার্নাল ও গবেষণা প্রতিবেদন, জাতীয় বাজেট ডকুমেন্ট ও বই-পুস্তক থেকেই এ নিরীক্ষাপত্রের তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে।
নিরীক্ষায় Cluster Sampling কৌশল ব্যবহার করে ২৪ জেলা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং উত্তরদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে Judgemental Sampling কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

এই নিরীক্ষা কাজটি সম্পন্ন করার বিভিন্ন উৎস থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উপাত্ত সরাসরি মাঠ পর্যায়ের উত্তরদাতার কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পরোক্ষ উপাত্ত উল্লেখিত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে বিভিন্ন বই, লেজার বই, লগ সিট, হাজিরা খাতা, বিভিন্ন তালিকা, প্রতিবেদন, রেজিস্টার খাতা পরিকল্পনাপত্র ইত্যাদি থেকে নেয়া হয়েছে। মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে জেলা ভিত্তিক পৃথক পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়, পাশাপাশি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত কম্পিউটারবেজড সফ্টওয়ার ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সামাজিক নিরীক্ষা কাজের সীমাবদ্ধতাসমূহ বা চ্যালেঞ্জ

সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তথ্য প্রাপ্তিতে কিছুটা বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে এখনও পরিপূর্ণ জনসচেতনতা তৈরী না হওয়াতে অনেকেই তথ্য প্রদানে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ বোধ করেননি। অনেকক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সত্ত্বেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কিছু কর্মচারি গোপনীয়তার দোহাই দিয়ে তথ্য দিতে চাননি। বিশেষ করে বাজেট সম্পর্কিত তথ্য দিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ অনীহা প্রকাশ করেছেন।

শিক্ষা

গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি ঃ এই গবেষণার জন্য পরিচালিত সামাজিক নিরীক্ষায় শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, এই তথ্য সংগ্রহের জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই জরীপ-এ শিক্ষা সেবা গ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবক এবং সেবা প্রদানকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত কমিটির সদস্য সকলের মতামত এবং তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । সেবা গ্রহণকারী সরকারি সেবার পর্যাপ্ততা, মান, দুর্বলতা এবং সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের স্বক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত প্রদান করেছেন।

গবেষণার এলাকা ঃ সুপ্র কাজ করে এমন ১২ টি জেলাতে এ জরীপ চালানো হয়েছিল। জেলাগুলো হলো– রাজবাড়ি, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, কুড়িগ্রাম, নাটোর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাঙ্গামাটি, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, বরিশাল এবং বরগুনা ।

নিরীক্ষার পরিধিঃ

- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত ও সংখ্যাগত অবস্থা
- ভর্তি
- শিক্ষা সমাপনী
- উপবৃত্তি
- মিড-ডে মিল
- বিনা মূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ
- ম্যানেজিং কমিটির ভূমিকা
- জনবল
- স্কুল পর্যায়ে সরকারের বাজেট বরাদ্দ
- স্কুল পর্যায়ে বরাদ্দকৃত বাজেটের সঠিক বাস্তবায়ন
- প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা কাঠামো

যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে

- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (প্রতি জেলা)
- উপজেলা শিক্ষা অফিসার (প্রতি উপজেলা)
- সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার (প্রতি উপজেলা)
- শিক্ষক (প্রধান শিক্ষক ১ জন এবং ১ জন নারী ও ১ জন পুরুষ শিক্ষক/প্রতি স্কুল)
- শিক্ষার্থী (৫ জন ছাত্রী ও ৫ জন ছাত্র/প্রতি স্কুল)
- অভিভাবক (৫ জন/ প্রতি স্কুল)
- ম্যানেজিং কমিটির সদস্য (সভাপতি ১ জন এবং সদস্য ১ জন/প্রতি স্কুল)

বই বিতরণ ও অভিযোগঃ

নতুন বই

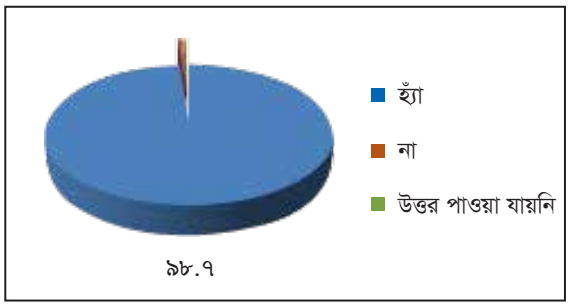

নতুন বই বিতরণে অভিযোগ

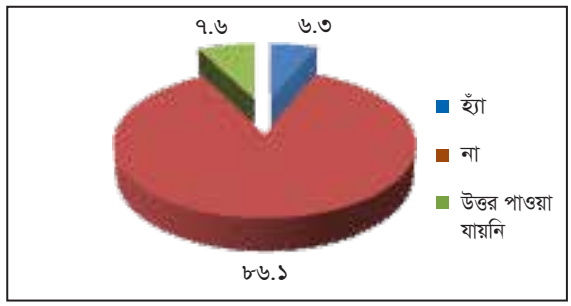

জরিপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের মধ্যে ৯৮.৭% জন শিক্ষক বলেছেন স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়েছে জানুয়ারি মাসে, তবে জেলা/ উপজেলা থেকে বই পেতে বিড়ম্বনার শিকার হয়েছেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ১০% জন। তারা মূলতঃ সময়মত বই না পাওয়া, টাকা দেয়া ও পরিবহন খরচ না দেয়া ইত্যাদি বিড়ম্বনার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে জরিপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের মধ্যে ৮৬.১%জনই শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরনে কোনো অভিযোগ নেই বলে জানিয়েছেন, তবে ১২% জন হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তারা বলেছেন ছেড়া বই, সব বই না পাওয়া ও বইয়ের মাঝে পৃষ্ঠা না থাকা ইত্যাদি অভিযোগ পেয়েছেন। এইসব অভিযোগের ভিত্তিতে ৮৮% জন শিক্ষক বই পরিবর্তন করে নতুন বই দিয়েছেন।

জরিপে অংশ নেয়া অভিভাবকদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, তাদের সন্তানেরা নতুন বই পেয়েছে কিনা। উত্তরে ৯৮.৭% জনই বলেছে এ বছর তাদের সন্তানেরা নতুন বই পেয়েছে এবং ৯৭% জনই জানুয়ারি মাসে পেয়েছে, মাত্র ২% জন ফেব্রুয়ারি মাসে বই পেয়েছে। বই বিতরণ নিয়ে অভিযোগ করেছে মাত্র ৬% জন অভিভাবকের সন্তানেরা আর ৮% জনের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরনের ক্ষেত্রে কোনো অভিযোগ আসেনি বলেছেন প্রায় ৯০%জন ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য।

এবছর নতুন বই পেয়েছে প্রায় সবাই, এর মধ্যে ৯৮% জনই জানুয়ারি মাসে বই পেয়েছে ও মাত্র ২% জন ফেব্রুয়ারি মাসে বই পেয়েছে। শতকরা ৯৬ জনই বলেছে যে বই পাওয়ার জন্য তাদেরকে কোন টাকা দিতে হয়নি, তবে ২% জন বলেছে তারা টাকা দিয়েছে এবং এর পরিমান উল্লেখ করেছে ৮৭% যারা ৫০টাকা থেকে ১০০ টাকা দিয়েছে আর মাত্র ১৪% জন দিয়েছে ২০০ টাকার বেশি।

পাঠদান ঃ

পাঠ পরিকল্পনা করতে হয় কি না

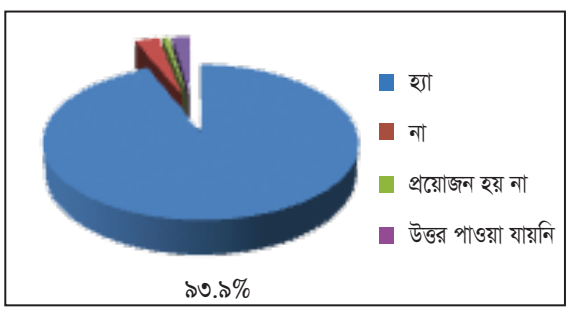

অভিভাবকদের মতে পাঠদানে শিক্ষকরা কোন ধরণের উপকরণের সহযোগিতা নেন কি না

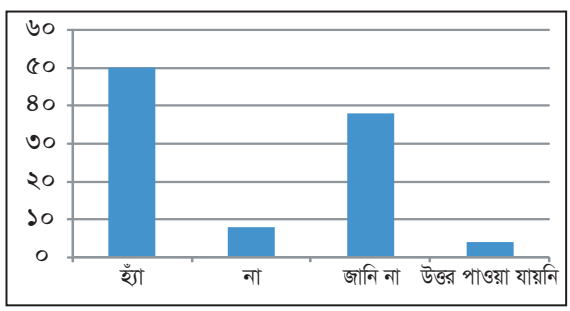

জরিপে অংশ নেয়া ৯৩.৯% জন শিক্ষকই বলেছেন যে, তাদেরকে পাঠ পরিকল্পনা করতে হয় এবং তাদের মধ্যে ৬৫% জন প্রধান শিক্ষকের কাছে ও ১৪% জন শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে পরিকল্পনা জমা দেন। ১৪% জন শিক্ষক বলেছেন পাঠ পরিকল্পনা সাধারনতঃ তৈরী করতে হয় তিন মাস পর পর, ৮% জন বলেছেন প্রতিমাসে ও ৪৯% জন শিক্ষক প্রতি সপ্তাহে পাঠ পরিকল্পনা করে থাকেন। পাঠ দান করতে গিয়ে ৯৬% জনই বিভিন্ন উপকরণের সহযোগিতা নিয়ে থাকেন এবং প্রায় সব শিক্ষকই (৯৯%) পাঠদানে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করেন।

অভিভাবকদের মধ্যে ৫৫% জন বলেছেন যে, শিক্ষকেরা পাঠ পরিকল্পনা করেন তবে ৩৮% জন এ ব্যাপারে জানেন না বলেছেন। আবার ৫০% অভিভাবক বলেছেন যে, শিক্ষকেরা পাঠদানের সময় বিভিন্ন উপকরণের সহযোগিতা নিয়ে থাকেন, কিন্তু ৩৮% জনের এ ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই।

কোচিং:

শিক্ষার মানোন্নয়নে অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসেবে স্কুলে কোচিং চালু আছে কিনা

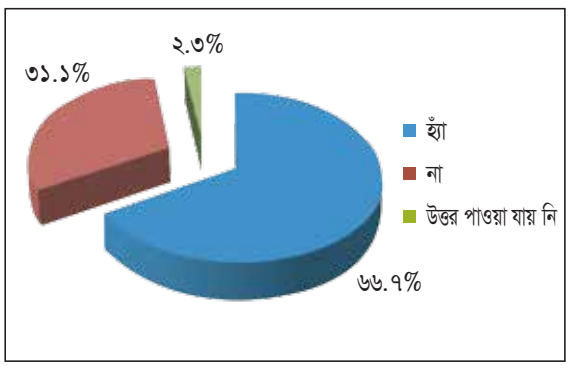

সন্তান স্কুলের বাইরে প্রাইভেট বা কোচিং এ যায় কিনা

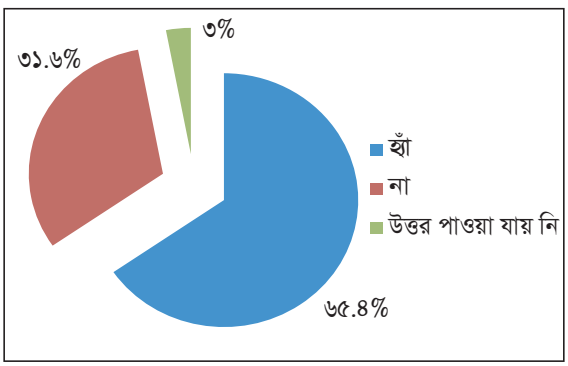

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৬৬.৭% জন শিক্ষক বলেছেন যে, শিক্ষার মানোন্নয়নে অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসেবে স্কুলে কোচিং চালু আছে ও তারা সবাই বলেছেন যে, কোচিং শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিবাচক প্রভাব রাখছে। তবে ৬১% জন বলেছেন কোচিং করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে অতিরিক্ত কোন টাকা দিতে হয় না।

জরিপে অংশগ্রহণকারী অভিভাবকদের মধ্যে ৬৫.৪% জন অভিভাবকদের সন্তানেরা স্কুলের বাইরে প্রাইভেট বা কোচিংয়ে যায়।

জরিপে অংশগ্রহণকারী ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের ৫২% জন বলেছেন যে শিক্ষকেরা কোচিং এর সাথে যুক্ত নন।

মোট ছাত্র-ছাত্রীর ৫৪% জন বিভিন্ন কোচিং করে থাকে, এর মধ্যে ৫৮% জন ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে ও ৪২% জন ছাত্র-ছাত্রী স্কুলের বাইরে কোচিং করে থাকে। আর স্কুলে কোচিং করলে টাকা দিতে হয় বলেছে ৩৭% জন শিক্ষার্থী এবং পরিমান উল্লেখ করতে গিয়ে তারা জানিয়েছে ৭২% জন দেয় ২০০/- থেকে ৩০০/-টাকা, ১৭% জন দেয় ৩০০/- থেকে ৬০০/- টাকা এবং প্রায় ১১% জন ৬০০/- টাকার বেশী দিয়ে থাকে।

শিক্ষার মানোন্নয়নে উপবৃত্তির ভূমিকা ঃ

উপবৃত্তি কি ধরনের ভূমিকা রাখছে (শিক্ষকদের মতে)

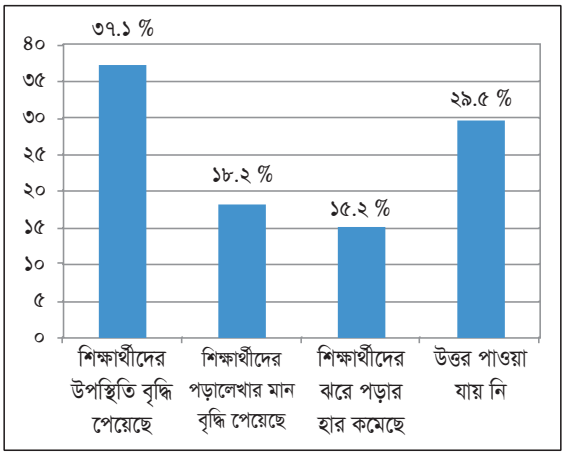

উপবৃত্তি কার্যক্রম শিক্ষার মানোন্নয়নে কি ভূমিকা রাখছে (ম্যানেজমেন্ট কমিটির মতে)

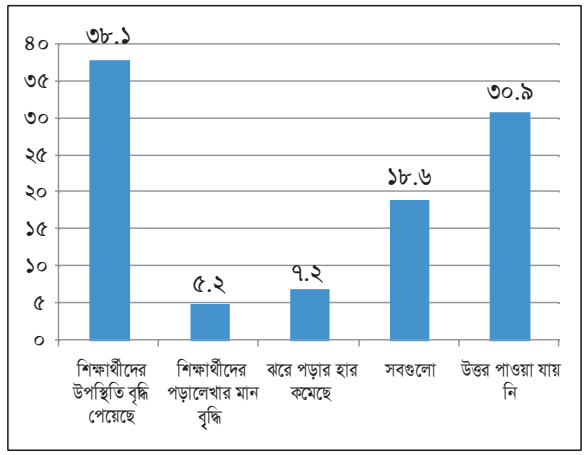

সন্তানের উপবৃত্তির টাকা কোন কোন খাতে খরচ হয় (অভিভাবকদের মতে)

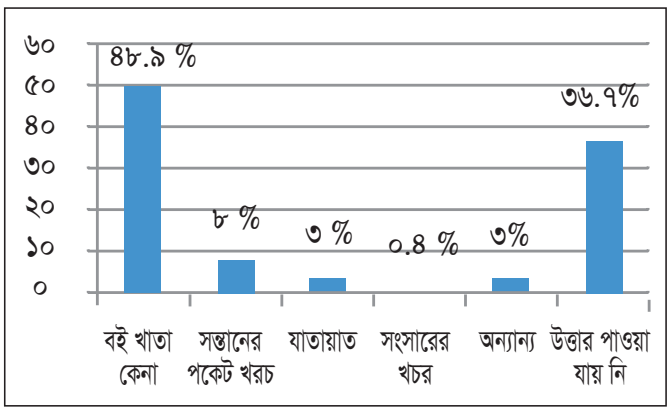

জরিপে অংশগ্রহনকারী শিক্ষকদের সাথে উপবৃত্তি প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা হয়। শতকরা ৪৬ জন বলেছেন যে, তাদের স্কুলে উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য দরিদ্র মেধাবী ছাত্র ছাত্রী বৃত্তির আওতায় রয়েছে, তবে ১৫% জনের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। এই শিক্ষকদের মধ্যে বেশীর ভাগই ৮১% জনই বলেছেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি কার্যক্রম শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। তারা বলেছেন শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৭.১% ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মান বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.২% ক্ষেত্রে ও শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার হার কমেছে ১৫.২% ক্ষেত্রে।

স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি সদস্যদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি কার্যক্রম শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে কিনা, উত্তরে ৮৬% জন হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন, যদিও ১০% জনের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে ৩৮.১% জন উল্লেখ করেছেন শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে, ৫.২% জন বলেছেন শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মান বৃদ্ধি পেয়েছে ও ৭.২% জন বলেছেন শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমেছে। তবে ৩০.৯% জনের কাছ থেকে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

জরিপে অংশ নেয়া অভিভাবকদের মধ্যে ৪১% জনেরই উপবৃত্তি পাওয়ার নিয়ম কানুন সম্পর্কে কোন ধারণা নেই আর এক্ষেত্রে প্রায় ১২% জনের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে ৬৫% জন অভিভাবকের সন্তানেরা উপবৃত্তি পেয়েছে। আবার ৬% জন অভিভাবক বলেছেন যে, উপবৃত্তির পাওয়ার জন্য তাদেরকে অর্থ দিতে বা তদবির করতে হয়েছে। উপবৃত্তি পাওয়া সন্তানদের অভিভাবকদের মধ্যে ৪৮.৯% জনই বলেছেন যে, উপবৃত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ তাদের সন্তানদের পড়ালেখার খরচ মেটানোর জন্য যথেষ্ঠ নয়, আর ২০% জন বলেছেন যে, পড়ালেখার খরচ মোটামুটি চালিয়ে নেয়া যায়।

মোট ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৬২% জনই উপবৃত্তি পেয়েছে এবং তা পাওয়ার জন্য ৬৫% জন বলেছে তাদেরকে কোন টাকা দিতে হয়নি। উপবৃত্তির টাকা তারা ফি প্রদান, বইপত্র কেনা, মা'কে দেয়া, প্রাইভেট শিক্ষকের খরচ ইত্যাদিতে ব্যয় করে।

ফিডিং প্রোগ্রাম

স্কুলে ফিডিং প্রকল্প আছে কি না

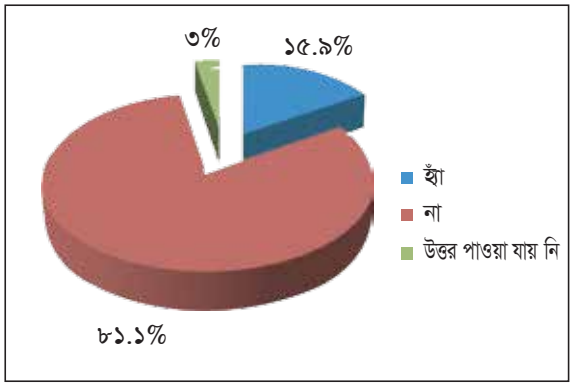

স্কুলে ফিডিং প্রকল্প

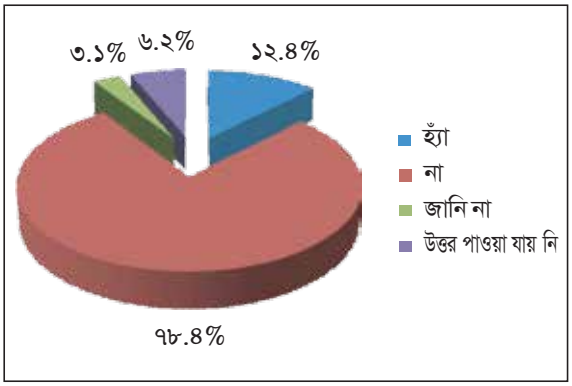

শতকরা মাত্র ১৫.৯ জন শিক্ষক বলেছেন যে তাদের স্কুলে ফিডিং প্রকল্প চালু আছে এবং তারা সবাই বলেছেন শিক্ষার্থীদের স্কুলে পুরো সময় ধরে রাখতে এই কার্যক্রম কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

স্কুলে টিফিন দেয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শতকরা মাত্র ১৪ জন অভিভাবক বলেছেন যে, তাদের সন্তানদের স্কুলে টিফিন দেয়া হয় এবং এর মধ্যে শতকরা মাত্র ১৬ জন বলেছেন যে টিফিন দেয়া হয় তা পর্যাপ্ত। তবে তাদের মধ্যে শতকরা ৯৪ জন অভিভাবকই বলেছেন যে, স্কুলে টিফিন দিলে তা শিক্ষার্থীদের স্কুলে যেতে উৎসাহিত করে।

শতকরা ৫৭ জন শিক্ষার্থী বলেছে স্কুল থেকে কোন টিফিন দেয়া হয় না আর মাত্র শতকরা ৯ জন বলেছে যে স্কুল থেকে টিফিন দেয়া হয় এবং তার পরিমান পর্যাপ্ত।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধাসমূহঃ

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধাসমূহ

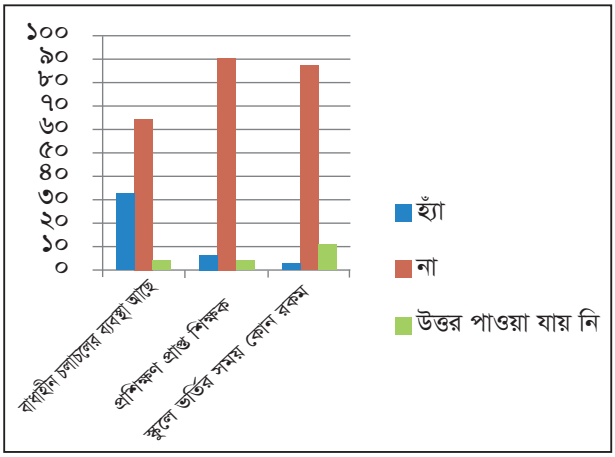

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধাসমূহ নিয়ে আলোচনা কালে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকেরা বলেছেন যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিার্থীদের জন্য স্কুলে বাধাহীন চলাচলের (র‍্যাম/ঢালু পথ/টয়লেট) ব্যবস্থা আছে মাত্র ৩৩% জনের ক্ষেত্রে, তবে ৪% জনের কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক আছে এমন মত দিয়েছেন মাত্র ৬% জন শিক্ষক; তবে ৮৭% জন বলেছেন যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিার্থীদের স্কুলে ভর্তির সময় কোন রকম বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের মধ্যে ৩২% জন বলেছেন যে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলে বাধাহীন চলাচলের (র‍্যাম/ঢালু পথ/টয়লেট) ব্যবস্থা আছে কিন্তু ৮৩.৫% জন বলেছেন যে, স্কুলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন শিক্ষক নেই। স্কুলের শৌচাগারগুলো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য উপযোগী কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে মাত্র ২০% জন অভিভাবক এবং ৪৬% জন শিক্ষার্থী বলেছেন উপযোগী শৌচাগারগুলো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য উপযোগী।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবস্থা

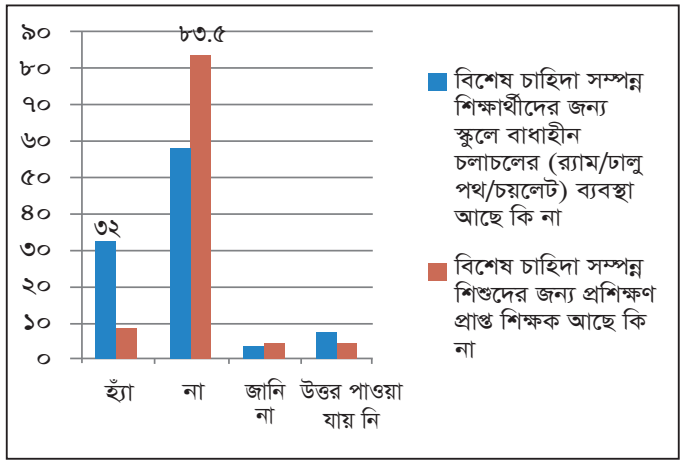

স্কুলের উপরিকাঠামো ঃ

জরিপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের সাথে শিক্ষা উপকরণ ও শ্রেনী করে পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করা হয়। তারা বলেছেন যে, শ্রেনী কক্ষে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের (বিদ্যুৎ সংযোগ) সুবিধা আছে প্রায় ৭৬.৫% ক্ষেত্রে ও ৬২.৯% জনের ক্ষেত্রে শ্রেনী কক্ষে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র (টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ) আছে। শতকরা ৩৯ জন শিক্ষক বলেছেন যে, তাদের শ্রেণী কক্ষে ৩০-৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী বসার ব্যবস্থা আছে, ৩২% জন বলেছেন তাদের শ্রেণী কক্ষে ৩৫-৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী বসার ব্যবস্থা আছে এবং ২৭% জন বলেছেন তাদের শ্রেণী কক্ষে ৫০ জনের বেশী ছাত্র-ছাত্রী বসার ব্যবস্থা আছে।

শতকরা ৭৩.৫ জন বলেছেন যে, তাদের শ্রেনী কক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ (ম্যাপ, ক্যালেন্ডার, দেয়াল লিখন) আছে এবং ৮৬% জন বলেছেন তাদের স্কুলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ আছে, আর ৮৩% জন তা ব্যবহার করেন। মাত্র ২৫% জন বলেছেন যে তাদের স্কুলে লাইব্রেরী আছে, তবে এক্ষেত্রে ১২% জনের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। আবার ৭৮% জন শিক্ষক বলেছেন যে তাদের স্কুলে কোন কম্পিউটার নেই আর ২০% জনের ক্ষেত্রে কম্পিউটার আছে ও তারা তা ব্যবহার করেন।

পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ আছে কি না

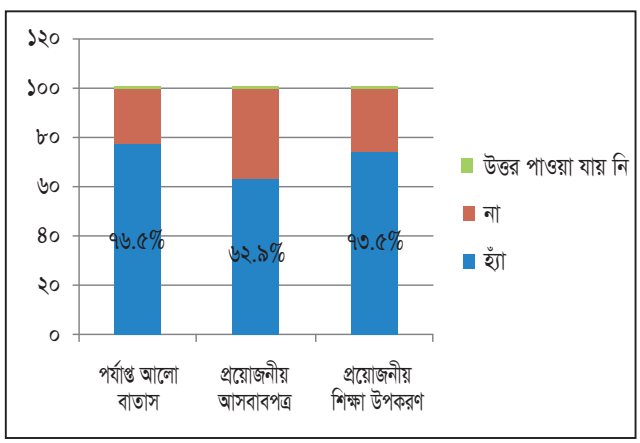

শতকরা ৭৮ জন শিক্ষক বলেছেন যে, তাদের স্কুলে নিজস্ব টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করেন আর মাত্র ১৬% জন বলেছেন তারা স্কুলের বাইরের টিউবওয়েল থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করেন। শিক্ষকদের জন্য আলাদা টয়লেট/শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে বলেছেন ৬৭% জন শিক্ষক আর মেয়ে ও ছেলেদের জন্য পৃথক টয়লেট/শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে বলেছেন ৪৯% জন শিক্ষক এবং ৪৩% জন শিক্ষক বলেছেন যে তাদের স্কুলে মেয়ে ও ছেলেদের জন্য একই টয়লেট/শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে। তবে ৪৬% জন শিক্ষকই বলেছেন যে, তাদের টয়লেট/শৌচাগার স্বাস্থ্যসম্মত কিন্তু ৩৮% জন টয়লেট/শৌচাগারের অবস্থা অস্বাস্থ্যকর বলে মন্তব্য করেছেন। শৌচাগারে পানির ব্যবস্থা আছে নিশ্চিত করেছেন মাত্র ৫১% জন শিক্ষক।

ক্লাসরুমগুলোতে ব্যবস্থা সমূহ

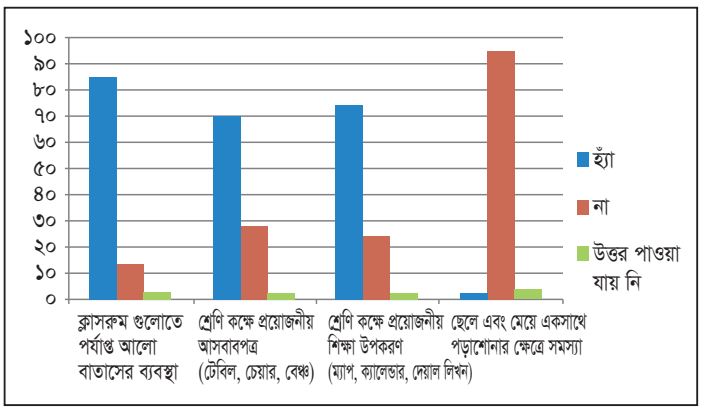

জরিপে অংশগ্রহণকারী অভিভাবকদের কাছে স্কুলের উপরিকাঠামো নিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল। শতকরা ৭৩ জন অভিভাবক বলেছেন যে, তাদের সন্তানদের স্কুলে নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা আছে, শতকরা ৬৮ জন অভিভাবক বলেছেন যে স্কুলে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে, আর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে বলেছেন ৪১% জন অভিভাবক। তবে মাত্র ২০% জন অভিভাবক বলেছেন যে, স্কুলের শৌচাগারগুলো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য উপযোগী।

শতকরা ৮৫ জন অভিভাবক বলেছেন যে, স্কুলের কাসরুমে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা আছে। শতকরা ৭০ জন বলেছেন যে, ক্লাসরুমে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র (টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ) আছে। আর শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ (ম্যাপ, ক্যালেন্ডার, দেয়াল লিখন) আছে বলেছেন শতকরা ৭৪% অভিভাবক। তবে ৯৫% অভিভাবকই বলেছেন যে, ছেলে মেয়ে একসাথে থাকায় তা পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা করে না।

বিদ্যালয়ের অবকাঠামো বিষয়ক আলোচনায় ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন যে, বিদ্যালয়ের নিজস্ব টিউবওয়েল থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করা হয় ৭৫% ভাগ ও স্কুলের বাইরের টিউবওয়েল থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করা হয় ১৯% ভাগ। স্কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা (ছাত্র/ছাত্রী) টয়লেট/শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে বলেছেন ৪১% জন, উভয়ের জন্য একই টয়লেট/শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে বলেছেন ৪৭% জন আর কোন টয়লেট/শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই বলেছেন ১০% জন। তবে মাত্র ১৭% জন বলেছেন যে, শিক্ষার্থীদের টয়লেট/শৌচাগার মোটেও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। আবার ৩২% জন বলেছেন যে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শির্থীদের জন্য স্কুলে বাধাহীন চলাচলের (র‍্যাম/ঢালু পথ/টয়লেট) ব্যবস্থা আছে কিন্তু ৮৪% জন বলেছেন যে, স্কুলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কোন শিক্ষক নেই।

ক্লাসরুমগুলোতে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা আছে বলেছে ৭৩% শিক্ষার্থী এবং শ্রেনীকক্ষে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র (টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ) আছে বলেছে ৭৯% জন, একইভাবে ৫১% জন বলেছে শ্রেনীকক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ (ম্যাপ,ক্যালেন্ডার, দেয়াল লিখন) আছে। ক্লাস ক্যাপ্টেন আছে বলেছে ৫৯% শিক্ষার্থী ও তাদের নির্বাচন হয় মূলতঃ ৪৯% ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে আর ৩৮% ক্ষেত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে।

শতকরা ৮৮ জন শিক্ষার্থী বলেছে যে, স্কুলে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা আছে আর ৭৫% জন বলেছে স্কুলে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার আছে।

স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিঃ

শতকরা ৪১ জন শিক্ষক নিশ্চিত করেছেন যে তাদের স্কুলের ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে আর ৫৪% জন শিক্ষক নিশ্চিত করেছেন যে তাদের স্কুলের ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠিত হয় মনোয়নের মাধ্যমে। তবে ৩০% জন শিক্ষক বলেছেন যে তাদের স্কুলের ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা নিয়মিত হয় না, যদিও শতকরা প্রায় ৫% জনের কোন উত্তর পাওয়া যায় নি। তবে বেশীরভাগ (৮৬%) শিক্ষকই বলেছেন যে, ম্যানেজমেন্ট কমিটি স্কুল পরিচালনায় সহায়ক।

ম্যানেজমেন্ট কমিটির কার্যক্রম

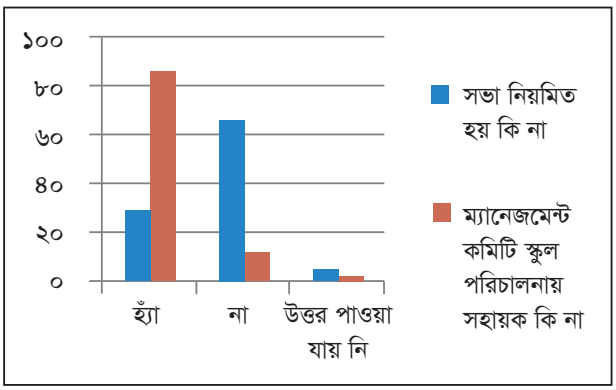

শতকরা ৮৮% জন অভিভাবকই কখনোই ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য ছিলেন না। আর ৬৮% জন অভিভাবক জানান যে, শিক্ষক-অভিভাবক সভা স্কুলে আয়োজন করা হয়, এটা তারা জানেন। তবে ৩৮% অভিভাবক কখনোই কোন শিক্ষক-অভিভাবক সভায় (পিটিএ) অংশগ্রহণ করেননি।

ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের মধ্যে ৬৩% জন বলেছেন ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা নিয়মিত হয়, তবে মাত্র ৪৩% জন বলেছেন ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভার বিবরণী সকল সদস্যের মাঝে বিতরণ করা হয়। বেশীরভাগ সদস্যই (৮৮% জন) বলেছেন স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি স্কুল পরিচালনায় সহায়ক। ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য হিসেবে ক্রয় কমিটিতে আছেন ৫৮% জন সদস্য এবং এই কমিটি মূলতঃ শিক্ষা উপকরণ ক্রয় (৩১%) ও অবকাঠামো উন্নয়ন উপকরণ (১৭%) ক্রয় করে থাকে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণঃ

প্রশিক্ষণ এর ধরণ

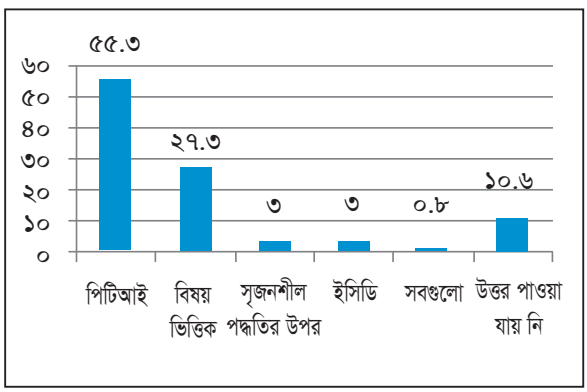

প্রশিক্ষণ বিষয়ক আলোচনায় ৭৯% জন শিক্ষকই কোন না কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন এবং এক্ষেত্রে ৫৫.৩% জন পিটিআই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ২৭.৩% জন শিক্ষক আর সৃজনশীল পদ্ধতি ও ইসিডি'র উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন মাত্র ৩% জন শিক্ষক। আর প্রশিক্ষণ পাওয়া শিক্ষকদের মধ্যে ৮৮% জনই প্রাপ্ত কৌশল পাঠদানে ব্যবহার করে থাকেন আর একই ভাবে প্রাপ্ত কৌশল ব্যবহারে কোন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করেন ৮৫% জন শিক্ষক।

ঝরে পড়া এবং বাধাঃ

শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ

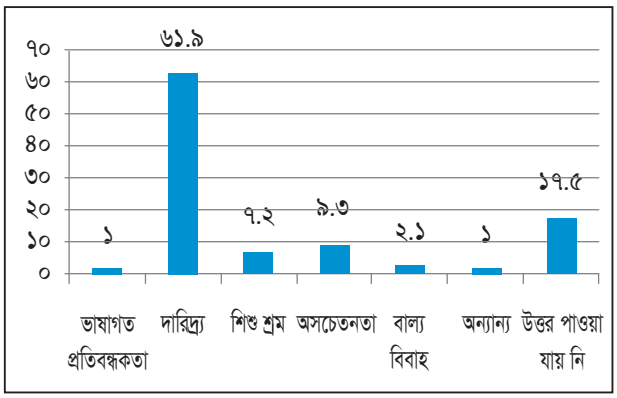

ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যরা স্কুলে নিয়মিত আসার ক্ষেত্রে দারিদ্রতাকে প্রধান বাধা (৬১.৯%) বলে মনে করেন, এক্ষেত্রে মাত্র ১৩% জন বাড়িতে কাজের চাপকে বাঁধা মনে করেন। আবার শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ হিসেবেও দারিদ্রতাকে প্রধান বাঁধা (৬২%) বলে তারা মনে করেন। তবে বেশীর ভাগ (৯৩%) ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যই মনে করেন স্কুলে ভর্তি আগের চেয়ে বেড়েছে।

শারীরিক শাস্তিঃ

শিক্ষক কর্তৃক কোন ধরণের শারীরিক শাস্তির শিকার হয় কিনা (অভিভাবকের মতামত)

স্কুলে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি প্রদান বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে মাত্র ১২.২% জন অভিভাবক বলেছেন যে, তাদের সন্তানেরা শিক্ষক কর্তৃক শারীরিক শাস্তির শিকার হয়েছে এবং এক্ষেত্রে মাত্র ১৫% অভিভাবক স্কুলে অভিযোগ করেছেন আর তা প্রধান শিক্ষকের কাছে করেছেন ৮৩.১% অভিভাবক, মাত্র ১২.২% অভিভাবক ম্যানেজমেন্ট কমিটির কাছে অভিযোগ করেছেন। যদিও ৫৩% জন অভিভাবক বলেছেন যে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

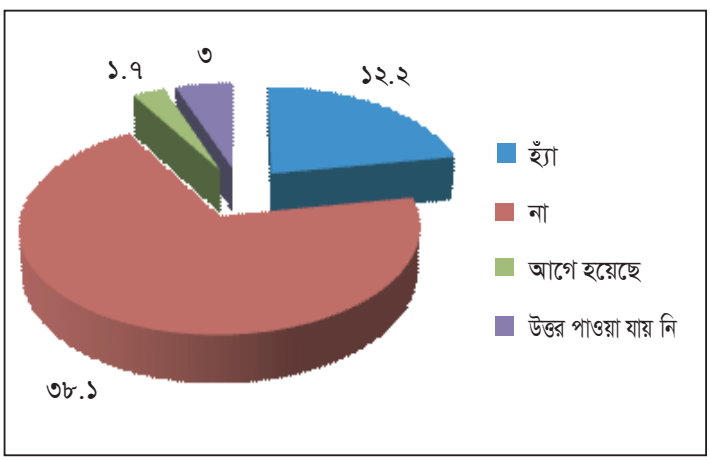

কেস স্টাডি - ১

রজব আলী, পিতা শামছুল হক, গ্রাম- তারিনিপুর। সে ডুগডুগি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করত। এখন মাদ্রাসার ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র। পিতা কৃষি শ্রমিক। রজব আলীরা ২ ভাই ১ বোন। ছোট ভাই ডুগডুগি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীতে পড়ে। ছোট বোনের বয়স ২ বছর। পিতার আর্থিক অবস্থা মোটেও ভাল না। কৃষি শ্রমিকের কাজ দৈনিক ১৫০/- টাকা করে পায়। তাই দিয়ে তাদের সংসার এবং ২ ভাইয়ের লেখাপড়ার খরচ। এত অল্প উপার্জন দিয়ে সংসার চালানোর পাশাপাশি ২ ছেলের লেখাপড়ার খরচ চালানো শামছুল হকের পক্ষে খুবই অবাস্তব। বর্তমানে লেখাপড়া শিখাতে হলে অনেক খরচ। প্রাইভেট পড়া, খাতা কলম কেনা, নোট গাইড কেনা অতিরিক্ত পোষাক কেনাসহ আরো অনেক খরচ। শামছুল হক এর অদম্য ইচ্ছা সে তার সন্তানদের লেখাপড়া শিখাতে চাই।

রজব আলী পূর্বের স্কুলের ৩য় শ্রেণীতে ২বার ফেল করলো। "বার বার ফেল, পড়া না হলি ছাররা মারে, দৈনিক কি অত অপমান সহ্য করা যায়, লজ্জা অপমানে পড়া বাদদি দিলাম, কিন্তু আব্বা শুইনলো না, আবার মাদ্রাসায় ভর্তি কইরে দিল, এখন ভালই পারি, ইবার আর ফেল কইরব না" বার বার ফেল করতে কেন? - "ভাল লেখাপড়া শিকতি হলি প্রাইভেট পড়তি হয়, আমরা গরিব মানুষ আব্বা প্রাইভেট পড়তি দিইতো না, সবাই প্রাইভেট পড়ে তাই তারা পাশ করে।" এখন তুমি ভাল পার কিভাবে - "আব্বা জন্ খাটে (লেবারের কাজ) আমাগের জন্ খাটতি দেবে না তাই বোলে যে তোগের পড়তি হবেই। এজন্যি গ্রামে আব্বা দোকান দিল, সকালে দাদি দোকানে বসে আমি মাদ্রাসায়তি আইসে ২ ঘন্টা পর্যন্ত একেনে বসি, বিকেলে আব্বা মাটেততি আইসে দোকান চালাই। এভাবে কষ্ট করে পয়সা জোগাড় করে আব্বা আমাগের দুভায়ের প্রাইভেট পড়ার টাকা জোগাড় করে। একন আর খুব বেশী সমস্যা হয় না"। প্রাইভেট পড়তে হবে কেন? তোমাদের স্কুলে স্যাররা তোমাদের ভাল পড়ায় না। "স্কুলি কি ঠিকমত পড়ালেখা হয়; পড়া না হলি ছাররা মারে, বেত দিয়ে মারে, চড় থাপ্পড় মারে, দাঁড় করিয়ে রাখে, আর সিদ্দিক স্যার (ছদ্দনাম) খালি ঘুমাই, পড়াটড়া ঠিকমত ধরেও না পড়ায়ওনা খালি বাড়ির পড়া দেয়, মাঝে মধ্যে ধরে না পারলি মারে। অন্যরা প্রাইভেট পড়ত তাই তারা মাইর খায়না, একন যেমন আমি পড়ি"।

দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের জন্য লেখাপড়ার খরচ যোগানো খুবই দুরুহ। প্রাথমিক শিক্ষা ফ্রি হলেও অন্যান্য খরচ বেশী। শিক্ষা ব্যবস্থা কৌশলগত কারণে বাণিজ্যিকীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকেই এখন প্রাইভেট পড়তে হবে, নোট/গাইড কিনতে হবে। নোট গাইড থেকে বেরিয়ে আসতে হলে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রাইভেট বা কোচিং এর যে চর্চা শুরু হয়েছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তা না হলে দরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

কেস-স্টাডি - ২

শারীরিক অসুস্থতার জন্য ঝরে পড়লো সুমিত্রা (রাজশাহী)

হরিণা উত্তর পাড়া গ্রামের মো. শহিদুল ইসলামের একমাত্র মেয়ে হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রী। সুমিত্রার বাবা একজন মৌসুমী ব্যবসায়ী। এই ব্যবসায় যা উপার্জন তা দিয়ে মোটামুটি স্বচ্ছলভাবে সংসার চলে যায়। অনেক স্বপ্ন নিয়ে মেয়েকে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়। সুমিত্রাও স্কুলে যেতে শুরু করে। যখন সে বিদ্যালয়ে যেত প্রায় সময় সে অসুস্থ্য থাকতো, নিয়মিত ক্লাস করতে পারতো না। সেজন্য সবার পেছনের বেঞ্চে বসতে হত। কারণ সে ছিল মেধার দিক থেকে দূর্বল। আর একারণেই স্কুলে যাওয়া আসার ক্ষেত্রে অনিহা প্রকাশ করতো। কিন্তু শিক্ষকদের তার প্রতি কোন বিশেষ নজর দিত না। এজন্য সুমিত্রার মাও সুমিত্রার সাথে স্কুলে যেত। তার বন্ধুরাও তার সাথে মিশতো না। এসব কারণে সুমিত্রা স্কুলের প্রত অনীহা সৃষ্টি হতে থাকে। শারীরিক অসুস্থ্যতার কারণে মেধা শক্তি কমে যাওয়ার জন্য পড়াশুনা তেমন ভাবে আগ্রহী ছিলনা। বিদ্যালয়ে (যাওয়া আসার ক্ষেত্রে একমাত্র বাঁধা সুমিত্রার শারীরিক অসুস্থ্যতা। এর মাঝেও পড়াশুনার প্রতি তার মানসিক ইচ্ছা ছিল প্রবল। কিন্তু সে পরিবার বা স্কুলের বিশেষ কোন নজর না থাকায় সে ধীরে ধীরে মানসিক দিক দিয়ে কিছুটা খারাপ প্রভাব পড়তো। এজন্য বা শিক্ষকের শারীরিক নির্যাতনের কারণও তার ঝড়ে পড়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।
এভাবেই সুমিত্রার স্কুল জীবন চলে আসছিল। ৪র্থ শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার পর সে খুব গুরুতরভাবে অসুস্থ্য হয়ে যাওয়ার ফলে সুমিত্রা আর স্কুলগামী হয়না। স্কুলে অনুপস্থিত থাকার কারণে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষিকা তাকে বার বার বোঝানোর ফলেও সে আর স্কুলগামী হয় না।

ছাত্র/ছাত্রীদের মতামতঃ

সর্বমোট ১২টি জেলার স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে এফজিডি আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে মূলতঃ চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাই অংশগ্রহন করেছে। উক্ত আলোচনার বিষয় ছিল পাঠ্য বই সরবরাহ, পড়াশুনার মান ও স্কুলের অবকাঠামোসহ ইত্যাদি আরো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। প্রায় সবাই জানিয়েছে যে, তারা নতুন পাঠ্যবই পেয়েছে এবং পাঠ্যবই সংগ্রহ বাবদ কোন টাকাও দিতে হয়নি। জানুয়ারি মাসেই তাদের হাতে নতুন বই পৌঁছে গেছে। পড়ালেখার মান বাড়ানোর জন্য স্কুলে কোচিং করানো হয় বলে জানা গেছে। তারা মনে করে যে, পরীক্ষার ফলাফল ভালো করার জন্য তাদের স্কুলের ক্লাসের বাইরেও অতিরিক্ত কোচিং করা প্রয়োজন । পড়ালেখার জন্য অতিরিক্ত কোচিং করতে তাদের আলাদা করে টাকা দিতে হয়। স্কুলের অবকাঠামোগত সুবিধা নিয়ে শিক্ষার্থীরা খুশী কারন বৃষ্টির দিনে ক্লাসে পানি পড়েনা এবং তাদের খেলার মাঠও রয়েছে। অসুস্থতা, বৃষ্টি ও বাড়িতে কাজের চাপের এসব কারনেই মূলতঃ প্রায়ই তাদের স্কুলে অনুপস্থিত থাকতে হয়। এসব নানাবিধ কারনে তাদের সাথে পড়ালেখা করত এমন অনেক শিক্ষার্থী এখনও স্কুল থেকে ঝড়ে পরেছে। স্কুলে অনুপস্থিতি এবং পড়ালেখায় অমনোযোগী থাকার কারন হিসেবে তারা শিক্ষকের বাজে ব্যবহার এবং শাস্তি দেয়াকে দায়ি করেছে । উপবৃত্তির টাকা সবাই পায় না বলে তারা জানায় এবং এই টাকাকে তারা পর্যাপ্ত বলে মনে করে না । উপবৃত্তির টাকা সাধারনতঃ পড়াশোনার কাজেই ব্যয় হয়। তবে এই টাকা উত্তোলন করার সময় শিক্ষকরা কোন টাকা কেটে রাখেন না।

সুপারিশ ঃ

শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। গবেষণাকালে শিক্ষার মান উন্নয়নে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ -

- বই বিতরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ম্যানেজমেন্ট কমিটির উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- স্কুল ম্যানেজিং কমিটি/এসএমসিতে অভিভাবক প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো প্রয়োজন।
- প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট সময় অনুসরণ করে পাঠ পরিকল্পনা করা প্রয়োজন, তাহলে প্রতিটি বিদ্যালয়ের পাঠদান কৌশল একরকম হবে এবং এভাবে শিক্ষার মান যাচাই করা সহজ হবে।
- ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের স্কুল পরিদর্শন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- শিক্ষার মানোন্নয়নে পরিচালিত কোচিং গুলো বন্ধ করে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পূর্বক এ খাতে শিক্ষার্থীদের অর্থ অপচয় রোধ করা প্রয়োজন।
- শিক্ষার মানোন্নয়ন, উপস্থিতি বৃদ্ধি ও ঝড়ে পরা রোধে উপবৃত্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও উপবৃত্তি বাবদ যে টাকা শিক্ষার্থীদের দেয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।
- একটা বড় অংশ অভিভাবক মনে করেন যে নোট বই শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অভিভাবকদের নোটবইয়ের প্রতি নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উদ্দোগ গ্রহন করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মকর্তাগণ ভূমিকা আবশ্যক ।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোচিং নির্ভরশীলতা লক্ষনীয়। অভিভাবকগণ একটা বড় অংকের টাকা এই কোচিং-এর জন্য ব্যয় করেন। বিদ্যালয়গুলো নিজেরাও এই কোচিং-এর ব্যবস্থা করে থাকে এবং অতিরিক্ত পয়সা আদায় করে থাকে। কোচিং নির্ভরশীলতা বন্ধে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে এবং সচেতনতা বাড়াতে হবে।
- উপবৃত্তি পাওয়ার নিয়ম প্রতিটি অভিভাবককে জানাতে সরকারকে উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।
- উপবৃত্তি শিক্ষার মানোন্নয়নে এবং ঝড়ে পড়া রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বিধায় সরকারকে উপবৃত্তির আওতা বাড়াতে হবে ।
- শারিরীক শাস্তি বন্ধে সরকারের সুস্পষ্ট আইন ও নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও শারিরীক শাস্তি এখনো বিভিন্ন মাত্রায় অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারকে কঠোর ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের পুরো সময় স্কুলে রাখতে ফিডিং প্রোগ্রাম কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারে বিধায় এ কার্যক্রমটির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এ অবহেলিত শিশুগুলোর জীবনকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে হবে ।
- শিক্ষার মানন্নোয়নের জন্য ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক এ অনুপাতের পরিবর্তন আনা প্রয়োজন অর্থাৎ ১ঃ৩০ করা প্রয়োজন।
- বিদ্যালয় পরিচালনায় ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে আরও সক্রিয় করতে হবে এবং অভিভাবকের অংশগ্রহন এ কমিটিতে নিশ্চিত করতে হবে।
- শিক্ষার মানন্নোয়নের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষন নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষত সৃজনশীল পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
- দরিদ্র শিশুদের জন্য বিকল্প সময় ব্যবহার করে তাদের শিক্ষা কার্যক্রমকে চলমান রাখার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে আনন্দময় পরিবেশ তৈরি ও পর্যাপ্ত বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা জরুরী।

স্বাস্থ্য

গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতিঃ এই গবেষণার জন্য পরিচালিত সামাজিক নিরীক্ষায় স্বাস্থ্যের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, এই তথ্য সংগ্রহের জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই জরিপ-এ সেবা গ্রহণকারী ও সেবা দানকারী উভয়েই সরাসরি অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের মতামত এবং তথ্য প্রদান করেছে। সেবা গ্রহণকারী সরকারি সেবার পর্যাপ্ততা, মান, দুর্বলতা এবং সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের স্বক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত প্রদান করেছেন।

সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমভুক্ত এলাকা : পাবনা, টাঙ্গাইল, শরিয়তপুর, কুষ্টিয়া, জামালপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, সুনামগঞ্জ, নোয়াখালি, নেত্রকোনা, লক্ষীপুর, সাতক্ষীরা এই ১২টি জেলাতে সামাজিক নিরীক্ষাটি চালানো হয়েছে ।
এই গবেষণায় ১২ টি জেলার তিনটি পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । পর্যায়গুলো হলো-

- উপজেলা পর্যায়
- ইউনিয়ন পর্যায়
- কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক

তথ্য সংগ্রহের পরিধিঃ

১. স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতার অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান
২. স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে জনগণের মতামত
৩. সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবার মান
৪. সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী স্বাস্থ্য শিক্ষা সেবা
৫. হাসপাতালের অবকাঠামো
৬. বিল্ডিং, চেয়ার-টেবিল, ফ্যান, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নিয়মানুযায়ী আছে কিনা (বিবরণ)
৭. প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা
৮. মানব সম্পদ
৯. ডাক্তার, নার্স ও টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ
১০. সমাজকল্যাণ তহবিলের কার্যকারিতা
১১. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং ইউনিয়ন পরিষদে গঠিত স্বাস্থ্য কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য

যাদের সাক্ষাতকার গ্রহন করা হয়েছেঃ

১. রোগী (বহিঃবিভাগ ও আন্তঃবিভাগ)
১. সিভিল সার্জন, আরএমও, এমও (জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল)
২. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান অফিসার
৩. স্যাকম, নার্স, এফডাব্লিওভি, এইচএ
৪. ফার্মাসিষ্ট
৫. টেকনিশিয়ান
৬. স্টোর কিপার
৭. স্থানীয় জনগণ
৮. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি

কমিউনিটি ক্লিনিক

কমিউনিটি ক্লিনিক গোটা বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের জন্য নতুন ধারনা । প্রতি ৬০০০ মানুষের জন্য একটি করে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের এই অনবদ্য ধারনার জনক বাংলাদেশ । ৩০ ধরনের ওষধ দিয়ে গর্ভবতী ও প্রসূতি মা, শিশুদের চিকিৎসা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, ডায়রিয়া চিকিৎসা দিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু হয়েছিল। সরকার এ পর্যন্ত মোট ১৩০০০ কমিউনিটি কিনিক চালু করেছে এবং বাকি ৫০০০ প্রক্রিয়াধীন আছে। সরকারি হিসাবমতে এইসব কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রতিদিন গড়ে ২০-২৫ জন রোগী সেবা নিতে আসে। এই জরীপে কমিউনিটি ক্লিনিক এর সেবাদাতা এবং কমিটি মেম্বারদের মতামত নেয়া হয়েছে ।

সেবাদাতা-হেল্‌থ কমিউনিটি ক্লিনিকঃ

স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে সামাজিক নিরীক্ষা-২০১৪ জরিপে হেল্‌থ কমিউনিটি ক্লিনিকের মোট ২৩জন সেবাদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েয়ে। এদের মধ্যে ৪৮% জন নারী ও ৫২% জন পুরুষ। আর সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ৮.৭% জন এইচ.এ, ৪.৩% জন এফডব্লিউএ ও ৮৭% জন কমিউনিটি হেল্‌থ প্রোভাইডার।

কোন পদে কর্মরত

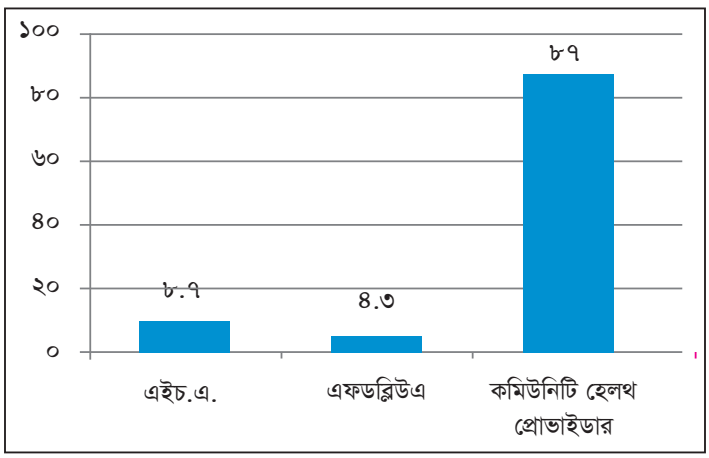

কেন্দ্র থেকে কি কি সেবা দেয়া হয়

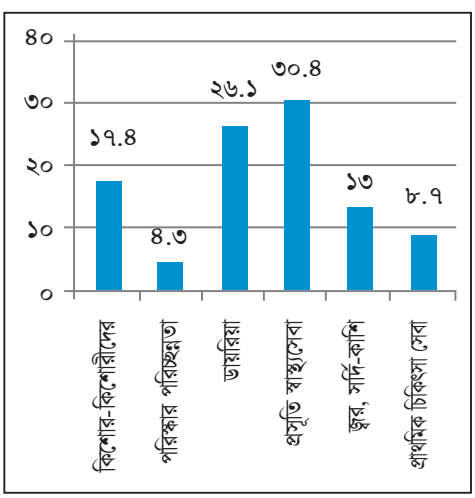

সেবার ধরণঃ

এসব ক্লিনিক থেকে সাধারণতঃ যেসব সেবা দেয়া হয় তার মধ্যে অন্যতম হলঃ প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা, জ্বর, সর্দি-কাশি, প্রসূতি স্বাস্থ্য সেবা, ডায়রিয়া, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সেবা ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা এবং ৭৮% জন বলেছেন যে, সেবাগ্রহণকারীদেরকে সেবা নেয়ার জন্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না।

শতকরা ৭৪ জন বলেছেন যে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী (খাবার বড়ি, কনডম) সরবরাহ করা হয় এবং এজন্য কোন টাকাও দিতে হয় না। সেবাদাতা সবাই বলেছেন যে ক্লিনিকে প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা ও শিশুদের টিকা দেয়া হয়, তবে নবজাতকের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেবা দেয়া হয় বলেছেন ৮৭% জন সেবাদাতা।

সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনগন সাধারণত কি কি বাঁধার সম্মুখিন হয়

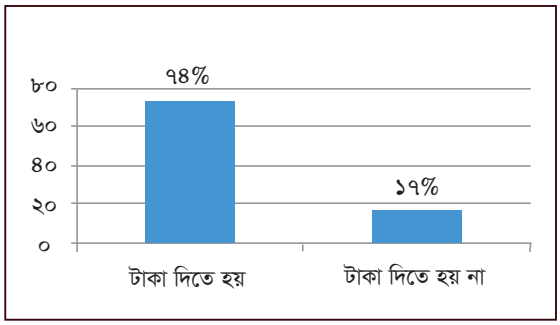

সেবা প্রাপ্তিতে বাঁধাঃ

সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনগন যেসব বাঁধার সম্মুখিন হন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অপ্রতুল ঔষধ (৪৭.৮% জন), প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব (৮.৭% জন), অপ্রতুল বিদ্যুৎ সরবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা (৮.৬%)।

সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনগন সাধারণত কি কি বাঁধার সম্মুখিন হয়

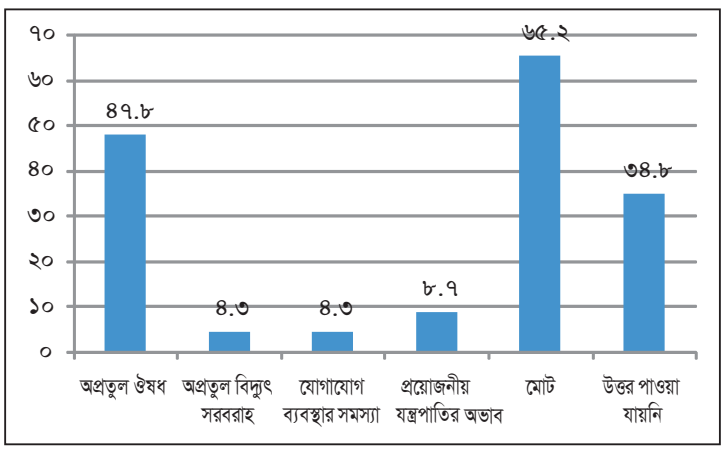

রোগীদের অন্যত্র রেফার করাঃ

বিশেষ জরুরী অবস্থায় সেবা গ্রহণকারীদেরকে বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রে পাঠানো হয়। এক্ষেত্রে ২১.৭% জন বলেছেন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, ৪৩.৫% জন বলেছেন উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ও ৮.৭% জন বলেছেন তাদেরকে জেলা হাসপাতালে উন্নততর চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছিল।

কোথায় রেফার করা হয়

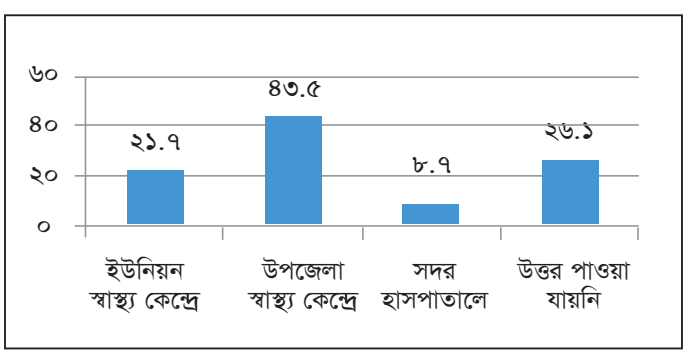

স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন ও তদারকি:

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিদর্শন রেজিস্টার আছে

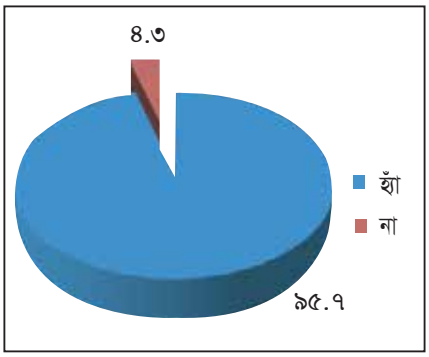

কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শকদের জন্য রেজিস্টার বই আছে বলেছেন ৯৫.৭% জন আর ৪.৩% জনের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। শতকরা ৫৬.৫ জন বলেছেন উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা সাধারণতঃ পরিদর্শন করেন আর ২৬.১% জন বলেছেন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা পরিদর্শন করেন। মাত্র ১৭.৪% জন জেলা সদর হাসপাতাল প্রতিনিধিরা পরিদর্শণ করেন। কিন্তু ৮৩% জন বলেছেন যে পরিদর্শনকারীরা তাদের মন্তব্য রেজিষ্টারে লিখেন। এক্ষেত্রে ১৭% জনের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। সেবাদাতাদের কর্মকান্ড মাঠ পর্যায়ে তদারক করা হয় বলেছেন ৯১% জন। এই তদারকি করেন ৭৪% জনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন বা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিনিধি আর ১৭% জনের ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যগণ।

কে/কারা এ পরিদর্শন করেন

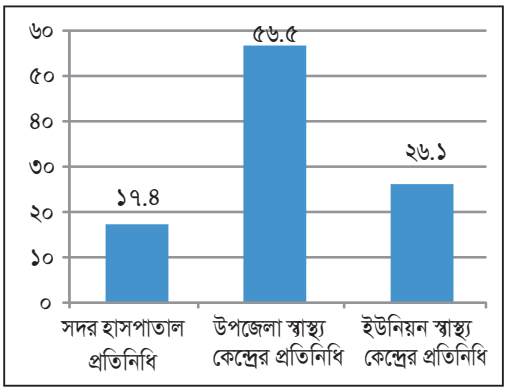

মাসিক প্রতিবেদন:

মাসিক প্রতিবেদনে কি কি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়

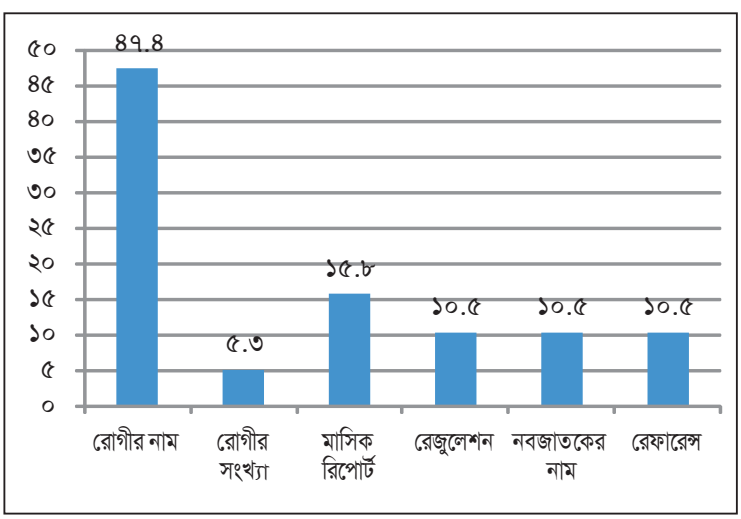

সেবাদাতাদের মধ্যে ৮৭%জন তাদের মাসিক প্রতিবেদন তৈরী করেন এবং তাদের মধ্যে ৯৫% জন তাদের প্রতিবেদন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান অফিস/ হাসপাতালে জমা দেন। উক্ত মাসিক প্রতিবেদনে রোগীর নাম, রোগীর সংখ্যা, মাসিক রিপোর্ট, রেজ্যুলিশন, নবজাতকের নাম ও রোগীর রেফারেন্স লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। শতকরা ৪৭.৪ জনই বলেছেন যে, মাসিক প্রতিবেদনে রোগীর নাম লিপিবদ্ধ থাকে।

কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটিঃ

কমিউনিটি কিনিকসমূহের ম্যানেজমেন্টের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে কথা বলে যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে ৯৫.৭% জন বলেছেন যে মাসে অন্তত একবার (১) পরিচালনা পর্ষদের সভা হয়ে থাকে। কমিউনিটি ক্লিনিকের পরিচালনা পর্ষদ ক্লিনিক তদারকির জন্য সাধারণতঃ যেসব পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন তার মধ্যে অন্যতম হলঃ

- ক্লিনিকের জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ডের ব্যবস্থা,
- ক্লিনিকের সার্ভিস মনিটর করা,
- প্রয়োজনীয় আসবাবের ব্যবস্থা করা,
- সেবার উন্নয়ন দেখাশোনা করা ও
- নিয়মিত মিটিং করা।

কমিউনিটি ক্লিনিকের পরিচালনা পর্ষদ নিয়মিত সভা

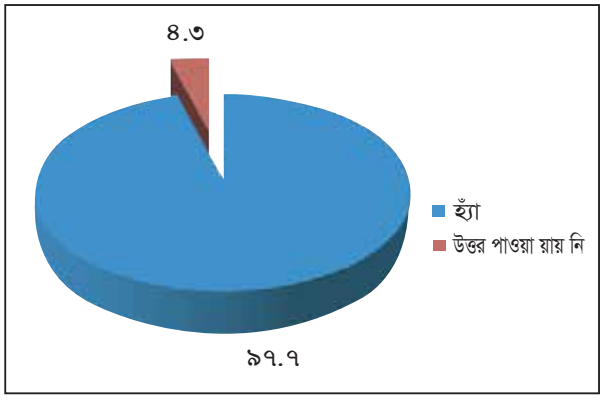

মানসম্মত সেবা প্রদানে চাহিদাঃ

মানসম্মত সেবা প্রদানের জন্য কি কি চাহিদা রয়েছে

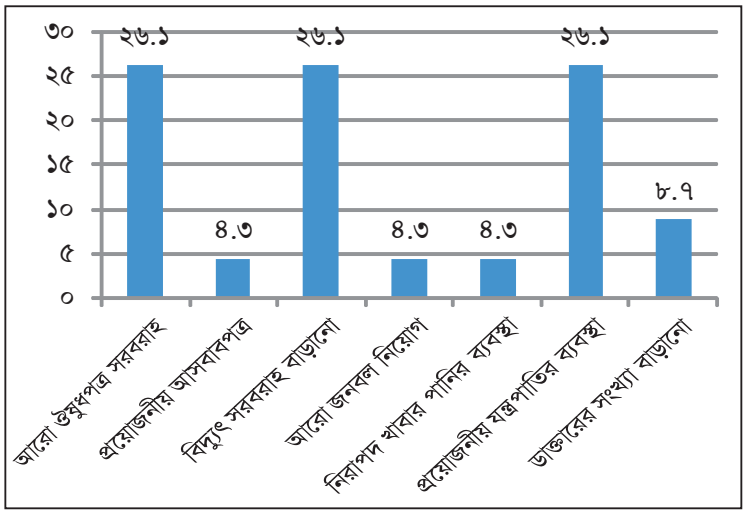

মানসম্মত সেবা প্রদানের জন্য তারা মনে করেন যে, আরো ঔষধপত্র সরবরাহ বাড়ানো, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানো, আরো জনবল নিয়োগ, নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা ও ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ানো জরুরী এবং ৩০% জন বলেছেন যে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র গতিশীল, টেকসই ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে কিছু বাঁধা/চ্যালেঞ্জ আছে, এর মধ্যে অন্যতম হলঃ ঔষধ পত্রের অপ্রতুলতা, সহকর্মীদের খারাপ ব্যবহার, উপরিকাঠামো সমস্যা ও বিদ্যুৎ অপ্রতুলতা। আরো ঔষধপত্র সরবরাহের তাগিদ দিয়েছেন ২৬.১%, এছাড়া ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলেছেন ৮.৭%। এসব বাঁধা/চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য তারা বলেছেন আরো ঔষধপত্র সরবরাহ বাড়ানো, সহকর্মীদের ব্যবহার উন্নতি, চাকুরী স্থায়ীকরণ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

কমিউনিটি ক্লিনিক ম্যানেজমেন্ট কমিটি সদস্য:

স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে সামাজিক নিরীক্ষা-২০১৪ জরিপে সর্বমোট ৪১ জন কমিউনিটি ক্লিনিক কমিটির সদস্যের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে, এদের মধ্যে ২৭% জন নারী ও ৭৩% জন পুরুষ। এদের মধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ৩৪% জন, সহ-সভাপতি ১০% জন, ৪৪% জন কমিটির সদস্য ও জমিদাতা ১২% জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২০% জন কৃষক, ১৭% জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ১৫% জন শিক্ষক, ১৫% জন গৃহিনী ও ২৯% জন জনপ্রতিনিধি। এছাড়া দিনমজুর ও ছাত্রও রয়েছে।

সভা ও তদারকি:

কমিউনিটি ক্লিনিকের পরিচালনা পর্ষদ নিয়মিত সভা করেন

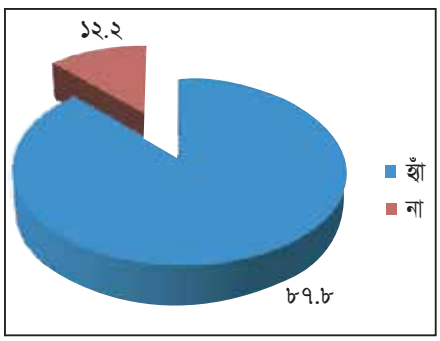

কমিউনিটি ক্লিনিকের পরিচালনা পর্ষদ ক্লিনিক তদারকির জন্য যেসব পদক্ষেপ নিয়ে থাকে

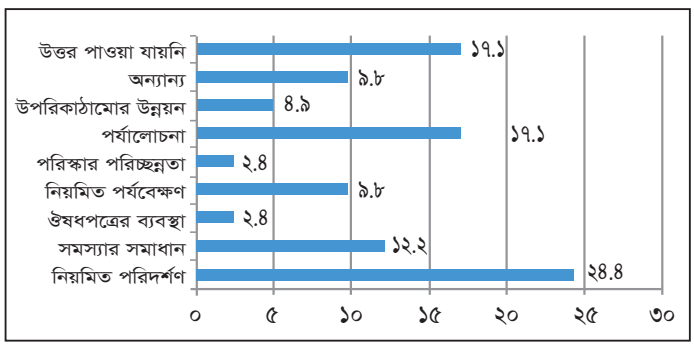

বলেছেন যে পরিচালনা পর্ষদের সভা নিয়মিত হয় এবং ৯৩% জন বলেছেন মাসে একদিন করে এই সভা হয়। ক্লিনিক তদারকীর জন্য সাধারণত কমিউনিটি ক্লিনিকের পরিচালনা পর্ষদ নিয়মিত পরিদর্শন (২৪.৪%), বিভিন্ন সমস্যার সমাধান (১২.২%), ঔষধপত্রের ব্যবস্থা (২.৪%), নিয়মিত পর্যবেক্ষণ (৯.৮%), পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা (২.৪%), পর্যালোচনা (১৭.১%) ও উপরিকাঠামোর উন্নয়নের (৪.৯%) পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন।

সেবার ধরণ ও প্রেসক্রিপশন:

শতকরা ৮৭ জন মনে করেন চিকিৎসা দেয়ার ক্ষেত্রে সেবাদানকারীরা রোগীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেন এবং ৮৮% জন বলেছেন কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে রোগীদের প্রেসক্রিপশন মোতাবেক বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হয়। এই ক্লিনিক থেকে পরিবার-পরিকল্পনা সামগ্রী (খাবার বড়ি, কনডম) সরবরাহ করা হয় বলেছেন ৭৮% জন কিন্তু সেজন্য তাদেরকে অর্থ দিতে হয় বলেছেন ৩৭% জন। কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে প্রসূতি মায়েদের সেবা দেয়া হয় বলেছেন ৯৫% জন এবং নবজাতকের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেবা দেয়া হয় বলেছেন ৯৩% জন। শতকরা ৯৮ জন বলেছেন যে ক্লিনিকে শিশুদের টিকা দেয়া হয়। তবে জটিল রোগীদেরকে অন্যত্র পাঠানো হয় আর তা বলেছেন ৯৩% জন।

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা:

সেবা কেন্দ্র পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় কমিউনিটি গ্রুপ সহায়তা করেন না বলেছেন মাত্র ১০% জন উত্তরদাতা আর এক্ষেত্রে এই কাজে যারা সহায়তা করেন তারা হলেন, ডাক্তাররা নিজেরাই, কমিটির সদস্যরা ও স্থানীয় জনগন। কমিউনিটি ক্লিনিকটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রক্ষার্থে কমিটি যেসব পদক্ষেপ নিয়ে থাকে তা হলো ক্লিনিকের সদস্যদেরকে সম্পৃক্ত করা, প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্নতা কর্মীর নিয়োগ দেয়া, পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা ও কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।

স্থানীয় জনগণের সাথে এফজিডি

- সর্বমোট ১২টি জেলার ১২ টি কমিউনিটি ক্লিনিক এর পার্শ্ববর্তী জনগনের সাথে ক্লিনিক নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে;
- আলোচনায় আংশগ্রহনকারীগন কমিউনিটি ক্লিনিকটি পরিচালনা সম্পর্কে তেমন খোঁজ খবর রাখেন বলে মনে হয়নি । ক্লিনিক পরিচালনার সাথে কারা কারা জড়িত এ ব্যপারেও তাদের ধারনা অস্বচ্ছ ;
- কমিউনিটি ক্লিনিকটির জন্য জমি বরাদ্দ এলাকার কেউ কেউ না কেউ দিয়েছেন কিন্তু পরিচালনায় তাদের ভূমিকা অত্যন্ত নগন্য ;
- কমিউনিটি ক্লিনিকটি পরিচালনার জন্য যে কোন সভা অনুষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে কোন ধারনা নেই ;
- ক্লিনিকগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব আছে ;
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে এবং এর সেবার মান ও পরিসর বাড়ানো উচিত ;
- সাধারণত লোকমুখে শুনে শুনে সেবাসমূহ সম্পর্কে জেনেছেন ;
- অনেকেই মনে করেন যে সেবা দানকারীরা রোগীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেন না ;
- সেবা পাওয়ার জন্যে রোগীদের কে প্রায়শই অধিক সময় অপেক্ষা করতে হয় ;
- রোগীদের প্রেসক্রিপশন মোতাবেক বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হয় না বললেই চলে ;
- প্রত্যেক ক্লিনিক থেকে প্রসূতি মায়েদের সেবা দেয়া হয়, তবে সেবার মান অনেক ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক না;
- ক্লিনিক থেকে বিনা মূল্যে পরিবার-পরিকল্পনা কাউন্সিলিং দেয়া হয়, তবে পরিবার-পরিকল্পনা সামগ্রী (খাবার বড়ি, কনডম) সবসময় বিনামূল্যে পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ রয়েছে ;
- এখানে শিশুদের টিকার ভালো ব্যবস্থা রয়েছে।

ইউনিয়ন পর্যায়

এই জরিপের সাথে সম্পৃক্ত এফজিডি-তে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত সেবা প্রদানকারীগণ অংশগ্রহন করেছে। অংশগ্রহনকারীদের পেশাগত অবস্থান এই গ্রাফে দেখানো হলো

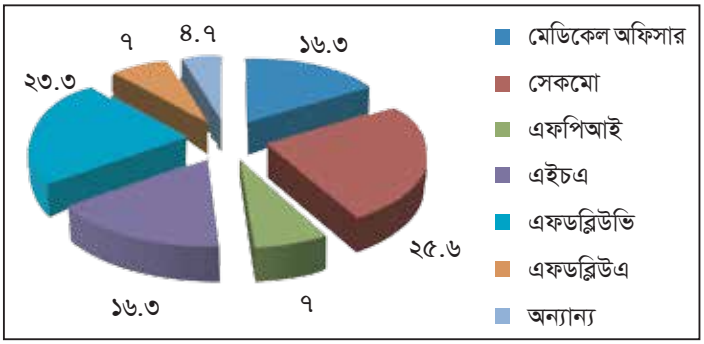

সেবা দাতা:

ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সেবা দাতা মোট ৪৩ জন স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে সামাজিক নিরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ৫১% জন নারী ও ৪৯% জন পুরুষ উত্তরদাতা রয়েছে। সেবাদাতাদের মধ্যে ১৬.৩% জন মেডিকেল অফিসার, ২৫.৬% জন স্যাকমো, ২৩.৩% জন এফডব্লিউভি, ১৬.৩% জন হেল্‌থ এসিস্টেন্ট ও বাকিরা অন্যান্য পদে কর্মরত।

সেবার ধরণ:

অংশগ্রহণকারী সকলেই বলেছেন যে এই কেন্দ্র থেকে প্রসূতি মায়েদের সেবা দেয়া হয়। এছাড়া ২৫.৬% জন এর মতে কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়, ১৪% জন বলেছেন যে পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়, ৩৯.৫% এর আভিমত কেন্দ্রে প্রসূতি সেবা দেয়া হয়, ৪.৭% জন বলেছেন জ্বর, সর্দিও কাশির সেবা এবং ২.৩% জন বলেছেন কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবাও দেয়া হয়ে থাকে। তারা আরও বলেন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে সাধারণতঃ জ্বর, চুলকানি, ডায়রিয়া, পরিবার পরিকল্পনা উপকরণ ও সর্দি-কাশির ঔষধও পাওয়া যায়।

কেন্দ্র থেকে কি কি সেবা দেয়া হয়

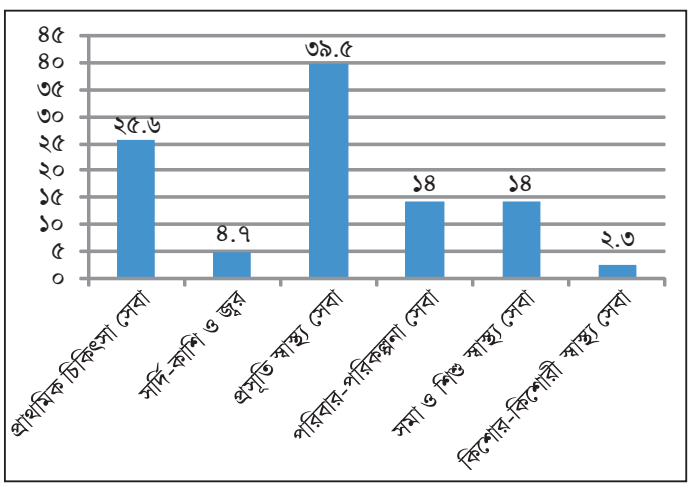

স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে কোথায় রেফার করা হয়

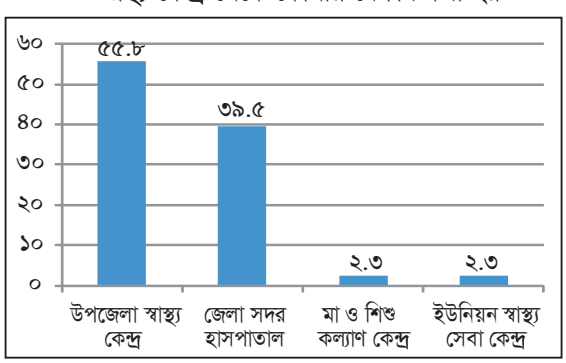

রোগীদের অন্যত্র রেফার করা:

রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সঠিকভাবে চিকিৎসা না দিতে পারলে ৫৫.৮% জন বলেছেন তারা রোগীদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৩৯.৫% জন বলেছেন জেলা সদর হাসপাতাল, ২.৩% মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও ইউনিয়ন স্বস্থ্য সেবা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন।

স্বাস্থ্য সেবার মানঃ

জরিপে অংশগ্রহনকারী সেবাদানকারীদের ৭৬.৭% জন বলেছেন যে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের জন্য যে অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম (যন্ত্রপাতি) থাকা দরকার তা নেই এবং ৭২.১% জন বলেছেন রোগীদের তুলনায় পর্যাপ্ত সেবাকর্মীও নেই। মাত্র ২৫.৬% জন বলেছেন রোগীদের তুলনায় কেন্দ্রে পর্যাপ্ত উপকরণ নেই।

স্বাস্থ্যসেবার মান

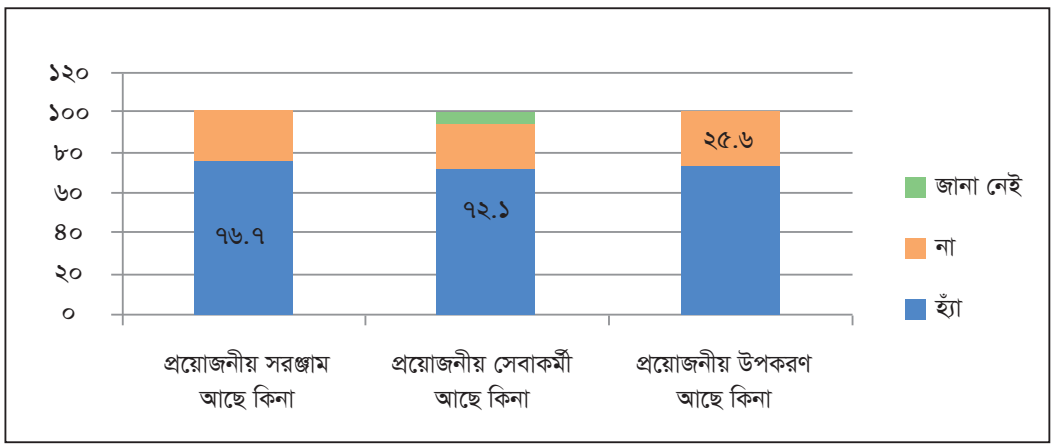

সেবা কেন্দ্রের মানোন্নয়নে সুপারিশঃ

সেবা কেন্দ্রের মানোন্নয়নে সেবাদাতারা বলেছেন যে, কেন্দ্রগুলোতে ডাক্তার ও দক্ষ জনবল বাড়ানো দরকার। এছাড়া তারা আরো বলেছেন যে, উপরিকাঠামো উন্নয়ন, সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করাও জরুরী।

সেবা কেন্দ্রের মানোন্নয়নে আপনার সুপারিশ

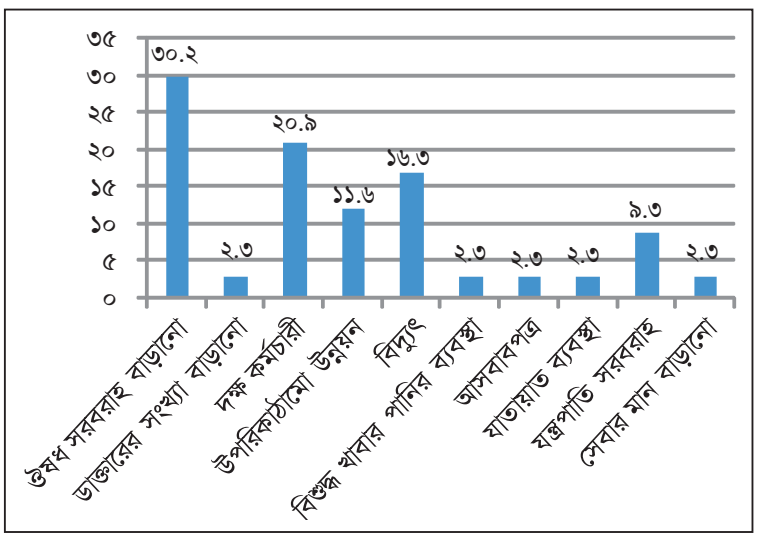

স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী

স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে সামাজিক নিরীক্ষা-২০১৪ জরিপে ১২ টি (বার) জেলার ইউনিয়ন পর্যায়ে সর্বমোট ৪৮ (আটচল্লিশ) জন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। আর এদের মধ্যে ৫০% জন নারী ও বাকী ৫০% জন পুরুষ সেবা গ্রহণকারী।

যে সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সেবা নেয়া হয়:

অসুস্থ্য হলে এদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬০.৪% জন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, শতকরা প্রায় ১৪.৬% জন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও শতকরা প্রায় ১২.৫% জন কমিউনিটি ক্লিনিকে আসেন। এছাড়া তারা জেলা হাসপাতাল (৬.৩%) ও স্থানীয় প্রাইভেট ডাক্তারের (৪.২%) কাছেও যান। এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেসব সেবা দেয়া হয় তার মধ্যে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা, জ্বর, সর্দি-কাশি, প্রসূতি সেবা, ডায়রিয়া, মা ও শিশু সেবা, প্রতিষেধক ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা অন্যতম।

অসুস্থ্য হলে কোন কোন সেবাকেন্দ্রে যাওয়া হয়

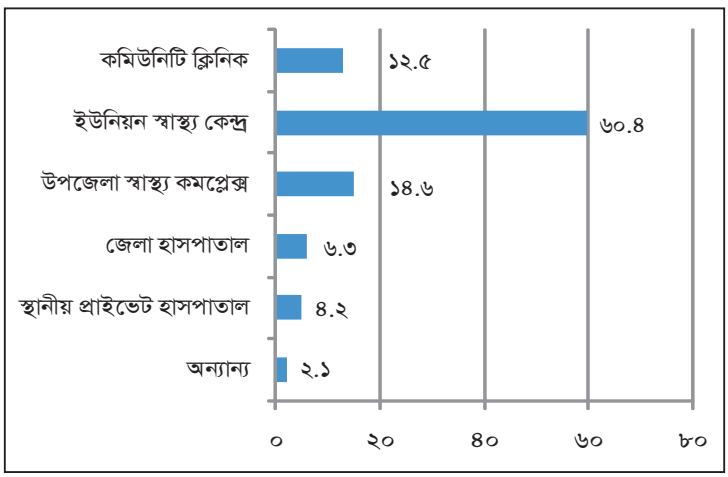

স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য:

স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্পর্কে কিভাবে তথ্য পাওয়া যায়

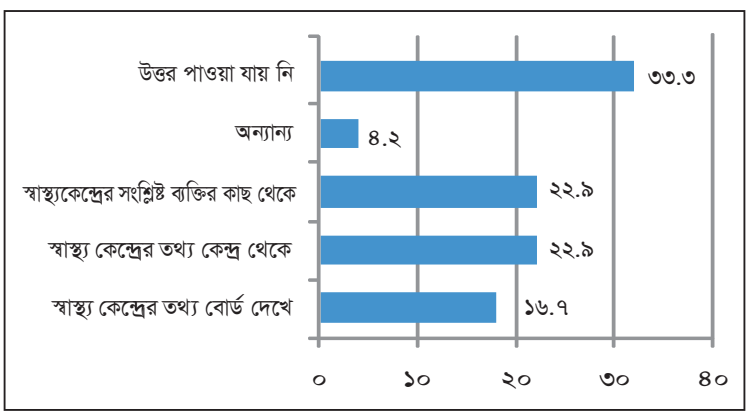

এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে যেসব সেবা দেয়া হয় তা জানেন ৬৬.৭% জন সেবাগ্রহণকারী এবং ২২.৯% জন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তথ্যকেন্দ্র ও একই সংখ্যক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে জেনেছেন। আর ১৬.৭% জন জেনেছেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তথ্য বোর্ড দেখে।

সেবার ধরণঃ

যেসব সেবা এ স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে দেয়া হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো- প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা, জ্বর, সর্দি-কাশি, প্রসূতি স্বাস্থ্য সেবা, ডায়রিয়া, মা ও শিশু সেবা, প্রতিষেধক ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা । অংশগ্রহনকারী শতকরা প্রায় ৮৫% জন সেবাগ্রহণকারী মনে করেন যে সেবা দানকারী তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেন ও তাদের প্রেসক্রিপশন দেন শতকরা প্রায় ৭১% জনকে। তবে শতকরা প্রায় ২৯% জন কোন প্রেসক্রিপশন পাননি। এই কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে ঔষধ দেয়া হয় বলেছেন শতকরা প্রায় ৬৭% জন আর শতকরা প্রায় ৪৬% জন বলেছেন যে তাদেরকে বাহির থেকে ঔষধ কিনতে হয়, তবে এব্যাপারে শতকরা প্রায় ২৫% জন কোন মন্তব্য করেননি। এই কেন্দ্র থেকে শতকরা প্রায় ৫৪% জন পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিয়েছেন ও শতকরা প্রায় ৬৫% জন বলেছেন যে তারা পরিবার পরিকল্পনার যাবতীয় উপকরণ পেয়েছেন। আবার শতকরা প্রায় ২৫% জন বলেছেন যে পরিবার পরিকল্পনার উপকরণের জন্য তাদেরকে টাকা দিতে হয়েছে, শতকরা প্রায় ৩৮% জনের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

সেবা প্রাপ্তিতে বাধাঃ

এসব কেন্দ্র থেকে সেবা পাওয়ার জন্য যেসব সমস্যার সম্মুখিন হতে হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- ঔষধের স্বল্পতা (২৯.২%), অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা (৮.৩%), কর্মচারী স্বল্পতা (২.১%), হৃদরোগীর চিকিৎসা নেই (২.১%), ডাক্তার স্বল্পতা (২.১%) ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্বল্পতা (৪.২%) ও অন্যান্য (৬.৩%) রয়েছে। তবে ৪৫.৮% জনের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে কি কি বাধার সম্মুখিন

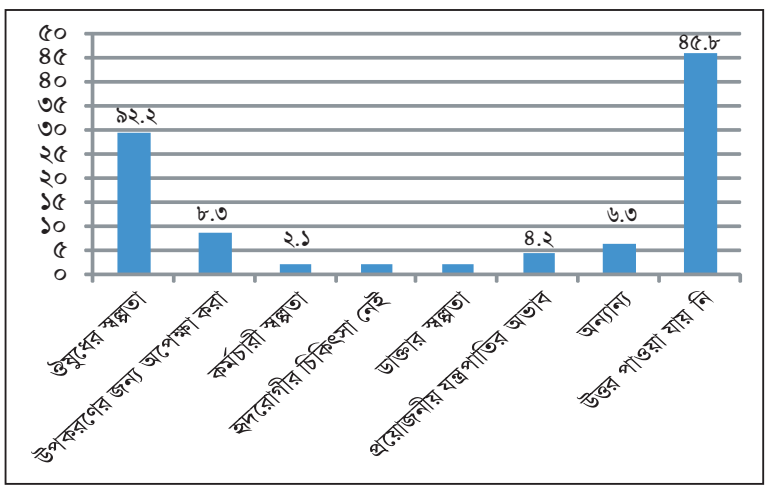

সেবাকেন্দ্রের পরিবেশ

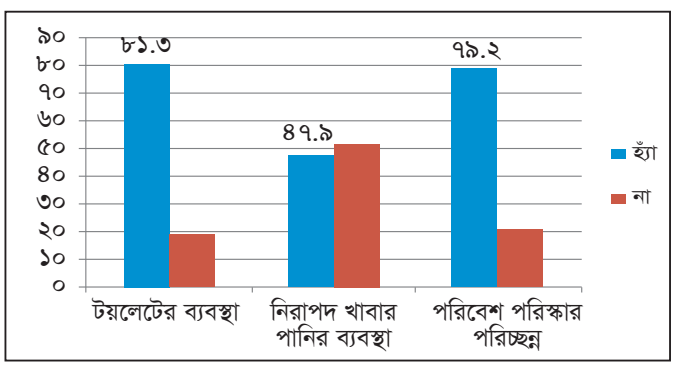

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিবেশঃ

শতকরা ৮১.৩ জন বলেছেন সেবাকেন্দ্রে টয়লেটের ব্যবস্থা আছে আর ৪৭.৯% জন বলেছেন নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা আছে ও ৭৯.২% জন বলেছেন কেন্দ্রের পরিবেশ বেশ পরিস্কার পরি"ছন্ন।

স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে পরামর্শ:

কেন্দ্রের সেবার মান উন্নয়নের জন্য সেবা গ্রহণকারীরা বলেছেন যে, কেন্দ্রে ঔষধের পরিমান বাড়ানো, উপরিকাঠামো উন্নয়ন, ফ্রি ঔষধের পরিমান বাড়ান, সেবার মান বৃদ্ধি, ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ান, আরো যন্ত্রপাতি আনা, অধিক কর্মচারী রাখা, ডাক্তারদের থাকার ব্যবস্থা করা ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা দরকার।

স্থানীয় জনগণ

স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে সামাজিক নিরীক্ষা-২০১৪ জরিপে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ১৩১ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে ৪৬% জন নারী ও প্রায় ৫৪% জন পুরুষ। উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রায় ২৫% জন গৃহিনী, ২২% জন জনপ্রতিনিধি, ১৮% জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ১৩% জন দিনমজুর। এছাড়াও ছিলেন কৃষক, কৃষি শ্রমিক, শিক্ষক, চাকুরীজীবি ও ছাত্র।

হেল্‌থ কমপ্লেক্সের সার্ভিস নিয়ে কিভাবে জেনেছে

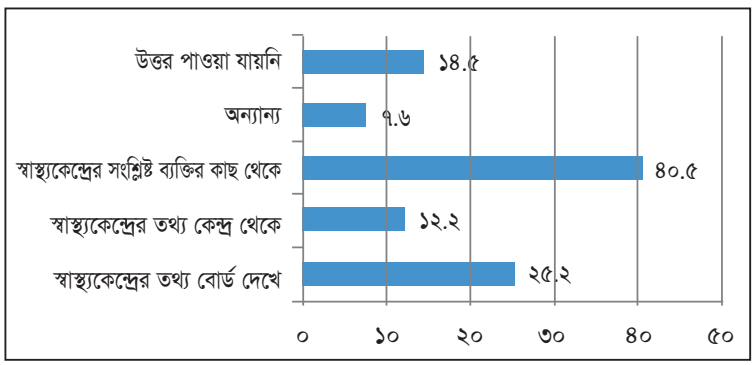

স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য:

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তথ্য বোর্ড দেখে হেল্‌থ কমপ্লেক্সের সার্ভিস সম্পর্কে জেনে ২৫.২% জন আর ১২.২% জন জেনেছেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তথ্য কেন্দ্র থেকে। এছাড়া ৪০.৫% জন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে জেনেছেন।

সেবার ধরণ:

যেসব সেবা পাওয়া যায়

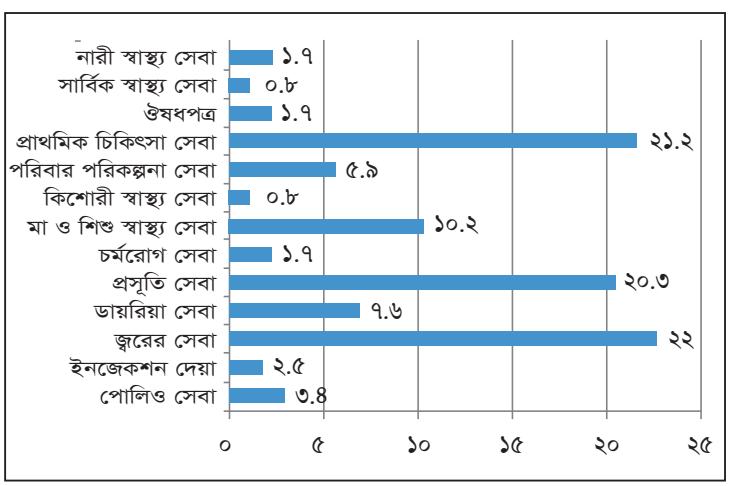

এসব কমিউনিটি ক্লিনিকে যেসব সেবা পাওয়া যায় সেগুলো হলো- পোলিও সেবা (৩.৪%), ইনজেকশন দেয়া (২.৫%), জ্বরের সেবা (২২%), ডায়রিয়া সেবা (৭.৬%), প্রসূতি সেবা (২০.৩%), চর্মরোগ সেবা (১.৭%), মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা (১০.২%), কিশোরী স্বাস্থ্য সেবা (০.৮%), পরিবার পরিকল্পনা সেবা (৫.৯%), প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা (২১.৯%), ঔষধপত্র (১.৭%), সার্বিক স্বাস্থ্য সেবা (০.৮%) ও নারী স্বাস্থ্য সেবা (১.৭%)। শতকরা প্রায় ৮৬% জন উত্তরদাতা বলেছেন যে সেবাদাতারা রোগীদের কথা মনযোগ দিয়ে শোনেন আর শতকরা প্রায় ১২% জন না-বোধক উত্তর দিয়েছেন। ৭৫% জন বলেছেন যে ক্লিনিক থেকে প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ফ্রি ঔষধ পাওয়া যায়, তবে ২২% জন বলেছেন যে ফ্রি ঔষধ পাওয়া যায় না। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৬% জন বলেছেন যে সেবা পাওয়ার জন্য তাদেরকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না।

ম্যানেজমেন্ট কমিটি:

ম্যানেজমেন্ট কমিটি নিয়মিত মিটিং করে থাকেন

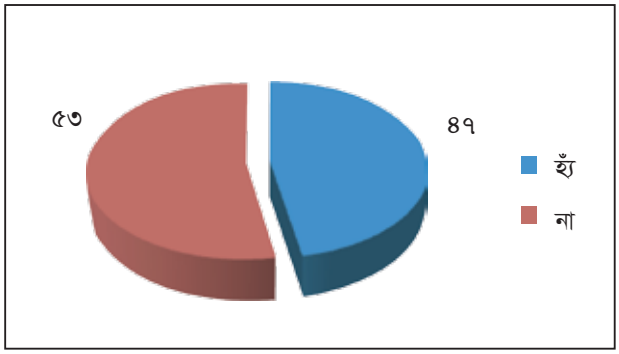

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৭% জন বলেছেন ম্যানেজমেন্ট কমিটি নিয়মিত মিটিং করে থাকেন। ৩১% জন উত্তরদাতা স্বীকার করেছেন যে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে।

ম্যানেজমেন্ট কমিটির পরামর্শ:

সমস্যা সমাধানে ম্যানেজমেন্ট কমিটির পরামর্শ মতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নতকরণ, পোষাকের ব্যবস্থা করা, আলোচনার ব্যবস্থা করা, আসবাবপত্রের ব্যবস্থা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

সেবার মান উন্নয়নের জন্য পরামর্শ

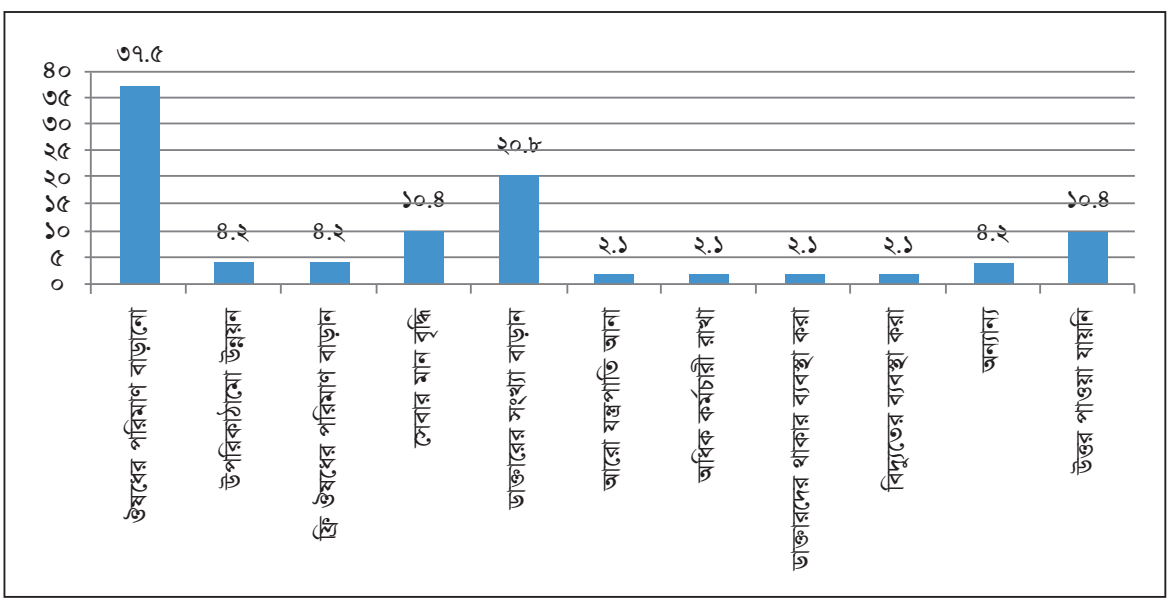

উপজেলা পর্যায়

হেল্‌থ টেকনিশিয়ান

স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে সামাজিক নিরীক্ষা-২০১৪ জরিপে সর্বমোট ৬৫ জন হেল্‌থ টেকনিশিয়ানের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল, এদের মধ্যে চার জন জেলা সদর হাসপাতাল ও ৬১ জন উপজেলা হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত। আবার এদের মধ্যে ৩৪% জন নারী ও ৬৬% জন পুরুষ টেকনিশিয়ান।

কর্তব্যরত স্টাফদের তালিকা সর্ব সাধারণের জন্য প্রদর্শন করা হয়

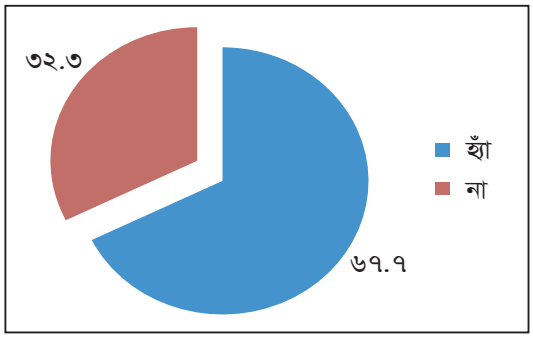

৬৭.৭% জন বলেছেন যে কর্তব্যরত স্টাফদের তালিকা সর্ব-সাধারণের জন্য প্রদর্শন করা হয় ।

৯১% জন বলেছেন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যতটুকু সেবা প্রদানের সুযোগ আছে তা জনগণ যথাযথভাবে পায়, কিন্তু ৯%জন বলেছেন জনগণ যথাযথভাবে পায় না। এর কারণ হিসেবে অবকাঠামোর অভাব, উপকরণের অভাব ও দক্ষ জনবলের অভাবকে উল্লেখ করেছেন। ৫২% জন বলেছেন যে এই প্রতিষ্ঠানে টেলি মেডিসিন সেবা চালু আছে।

সেবার ধরণঃ

সেবাসমূহ পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণ

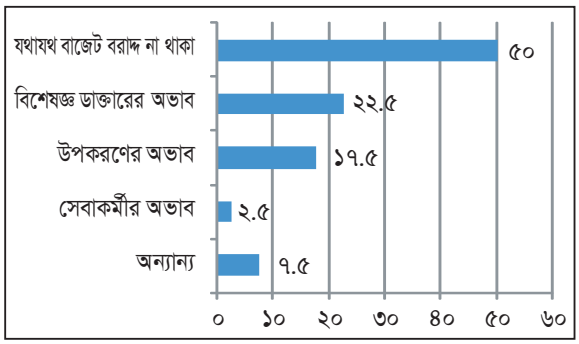

এই প্রতিষ্ঠানে মা ও শিশুর জন্য যে ধরণের সেবা প্রদান করা হচ্ছে তা স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত নয় বলেছেন ৪৬.৬% জন আর এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যথাযথ বাজেট বরাদ্দ না থাকা (৫০%), বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভাব (২২.৫%), উপকরণের অভাব (১৭.৫%) ও সেবা কর্মীর অভাবকে (২.৫%)। স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের জন্য যে অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম (যন্ত্রপাতি) থাকা দরকার তা নেই বলেছেন শতকরা ৫০% জন আর এর কারন গুলো হলো বাজেট স্বল্পতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও কেন্দ্রমুখী পরিকল্পনা।

শতকরা প্রায় ৬৯ জন বলেছেন যে সেবাকেন্দ্রে যেসব যন্ত্রপাতি রয়েছে তা দিয়ে বিনামূল্যে সেবা দেয়া হয়। প্রায় ৫৯% জন বলেছেন যে সেবাগ্রহণকারীর অনুপাতে পর্যাপ্ত সেবাদাতা এবং প্রায় ৪৯% জন বলেছেন সেবাগ্রহণকারীর তুলনায় পর্যাপ্ত উপকরণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে নেই। উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রায় ৮২% জন উপকরণ না থাকার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানিয়েছেন আর মাত্র ২৫% জন বলেছেন এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছে। যদিও প্রায় ৩৫% জনের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। আর পদক্ষেপ না নেয়ার কারনগুলো হলো বাজেট স্বল্পতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও গুরুত্বের অভাব। তবে প্রায় ৬২%জ ন বলেছেন যে কেন্দ্রগুলো থেকে সেবা পাওয়ার জন্য তাদেরকে ফি প্রদান করতে হয়েছে।

ঔষধের তালিকা:

হাসপাতালে/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ঔষধের তালিকা আছে বলেছেন ৯০.৮% জন আর বরাদ্দকৃত ঔষধ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ঠ নয় বলেছেন প্রায় ৭৫% জন। তবে প্রয়োজনীয় ঔষধ পাওয়া যায় না বলেছেন প্রায় ২০% জন আর প্রায় ২৬% বলেছেন যে পাওয়া যায়। আর না পাওয়ার কারণ হিসেবে প্রায় ৮৬% জন বলেছেন যে প্রয়োজনীয় ঔষধের বরাদ্দ কম।

হাসপাতালে/স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঔষধের তালিকা

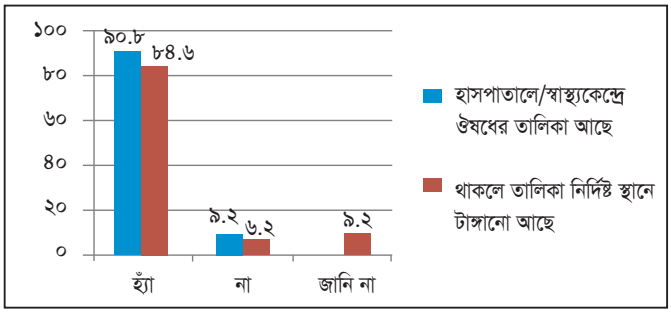

অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম:

হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এ্যাম্বুলেন্স আছে বলেছেন প্রায় ৯৪% জন, যদিও প্রায় ৮৫%জ ন বলেছেন যে সেগুলো বর্তমানে সচল আছে। আর যেগুলো সচল নেই তার মধ্যে প্রায় ১৯% জন বলেছেন যে সেগুলো মেরামতের অযোগ্য। কেন্দ্রগুলোতে এ্যাম্বুলেন্সের ভাড়ার কোনও তালিকা নেই বলেছেন মাত্র ৯% জন। প্রায় ৯৮% জন বলেছেন হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কিন্তু বিকল্প বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে বলেছেন প্রায় ৭৭% জন। এর মধ্যে বিকল্প হিসেবে প্রায় ৯২% জন বলেছেন জেনারেটর আর প্রায় ৬% জন বলেছেন আইপিএস এর কথা আর এসব বিকল্প ব্যবস্থাসমূহ সচল আছে বলেছেন প্রায় ৭১%জন।

সিভিল সার্জন, আর.এম.ও এবং এম.ও:

- ১২ জেলার সিভিল সার্জন, আর.এম.ও এবং এম.ও গন মনে করেন যে, হাসপাতালে পর্যাপ্ত জনবল নেই। স্বাস্থ্যখাতে এখনও ১৯৬৮ সালের জনবল কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে।
- সেবা দেয়ার জন্য নার্সদের পদসংখ্যা যথেষ্ট নয়।
- স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হলে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও উপকরনের সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।
- হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিরবিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা খুব গুরুত্ব পূর্ণ ও জরুরী। রোগীর বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা যেমন- আল্ট্রাসনোগ্রাফি ইত্যাদি সম্পন্ন করার জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ অপরিহার্য যা নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।

স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী

হাসপাতালের ধরণ

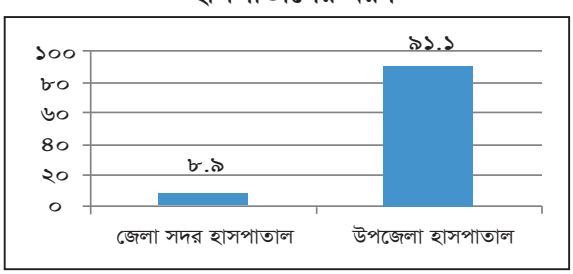

উত্তরদাতার ধরণ

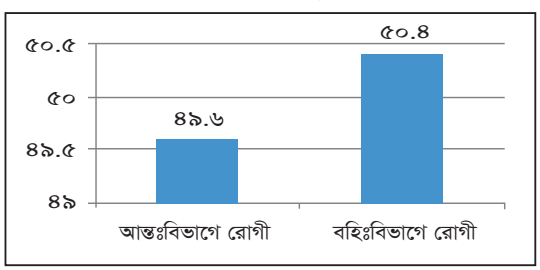

স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে সামাজিক নিরীক্ষা-২০১৪, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী সর্বমোট ২৩৬ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ৯১% জন উপজেলা হাসপাতাল ও প্রায় ৯% জন জেলা সদর হাসপাতালের। প্রায় ৫০% জন আন্তঃবিভাগের ও প্রায় ৫০% জন বহিঃবিভাগের রোগী এবং প্রায় ৫২% জন নারী ও প্রায় ৪৮% জন পুরুষ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী। অসুস্থ্য হলে এসকল রোগীরা সাধারণতঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (প্রায় ৬৬%), জেলা হাসপাতাল বা প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে (প্রায় ৭%) এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে গিয়ে থাকেন।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য:

এ সেবা কেন্দ্রের প্রদেয় সেবা সম্পর্কে জানেন প্রায় ৫৬% জন সেবা গ্রহনকারী । তাদের মধ্যে ৪৭.১% জন জানিয়েছেন যে, হাসপাতাল/ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে তারা সেবা সম্পর্কিত তথ্য পেয়েছেন । ২৪.৫% জন হাসপাতাল/ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তথ্য বোর্ড দেখে আর ১২.৩% জন হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তথ্য কেন্দ্র থেকে জেনেছেন, অন্যদিকে ৪৪% জন সেবা গ্রহনকারী সেবা সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

সেবাসমূহ সম্পর্কে যেভাবে অবগত হয়েছেন

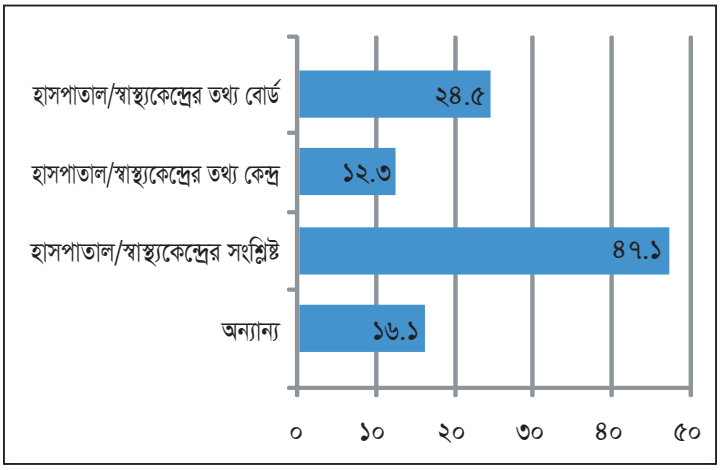

প্রেসক্রিপশন ও ঔষধ:

সেবাগ্রহণকারীদের প্রায় ৯২% জনই বলেছেন ডাক্তাররা তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকেন আর ৯৮% ক্ষেত্রেই ডাক্তাররা প্রেশক্রিপশন দেন। তবে মাত্র ১০% জন বলেছেন যে প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী তারা হাসপাতাল থেকে ঔষধ পেয়েছেন। এক্ষেত্রে ৯.৭% জন বলেছেন যে তারা সকল প্রকার ঔষধ পেয়েছেন, ৭৯.২% জন প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী হাসপাতাল থেকে কিছু কিছু ঔষধ পেয়েছেন। যাদেরকে ঔষধ কিনতে হয়েছে তাদের মধ্যে ৮৪% জনই পাশের দোকান থেকে ঔষধ ক্রয় করেছেন। প্রায় ৯৪% জনই বলেছেন যে হাসপাতাল থেকে ঔষধের জন্য তাদেরকে কোন টাকা দিতে হয় না, তবে প্রায় ১৩% জনের কাছ থেকে এব্যাপারে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মোতাবেক হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ঔষধ পেয়েছেন

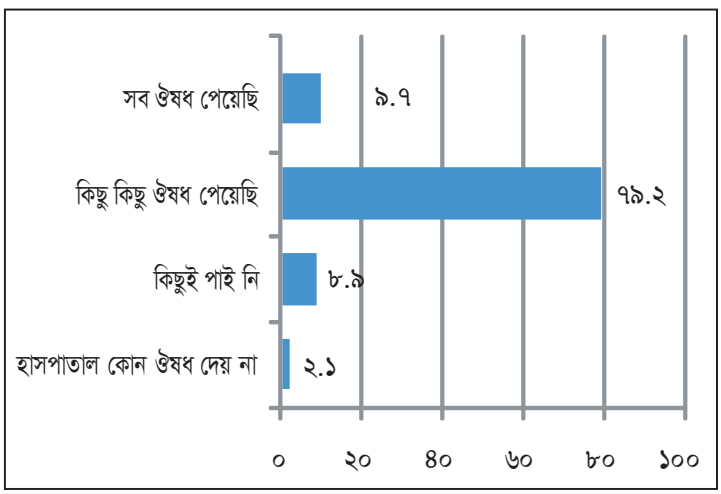

অতিরিক্ত অর্থ প্রদান:

হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য প্রদেয় ফি'র জন্য রশিদ পেয়েছেন প্রায় ৫৬% জন, কোন রশিদ পাননি প্রায় ২১% জন আর প্রায় ২৩% জনের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। আর মাত্র ৫% জনকে নির্ধারিত ফি ব্যতিত অতিরিক্ত অর্থ বা ফি দিতে হয়েছে, এক্ষেত্রেও ৯% জনের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। অতিরিক্ত অর্থ বা ফি প্রদানের বিষয়কি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে মাত্র ৪০% জন। আর কর্তৃপক্ষ মাত্র ১৯%ভ াগ ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

প্যাথলজি পরীক্ষা:

প্রয়োজনীয় প্যাথলজি পরীক্ষা করাতে হলে সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে ৩২.২% জন হাসপাতাল থেকে, ১৬.১% জন ক্লিনিক থেকে ও ১৫.৩% জন ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে করে থাকেন। পরীাগুলো হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে করালে তার জন্য ফি দিয়েছেন ৪২% জন সেবাগ্রহীতা।

প্রয়োজনীয় প্যাথলজি পরীক্ষা করিয়েছেন

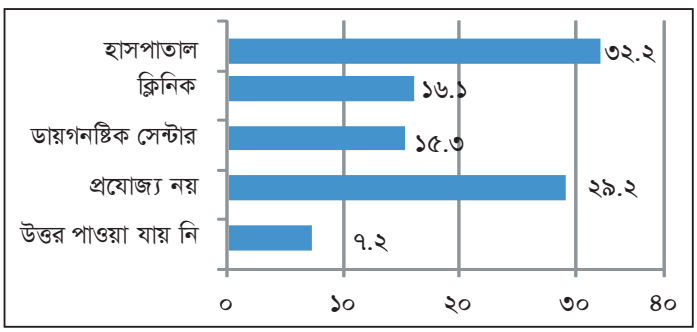

ডাক্তার ও নার্স সম্পর্কিত তথ্য:

ওয়ার্ডে নার্সরা নিয়মিত আসেন বলেছেন প্রায় ৪৭% জন আর ডাক্তাররা আসেন বলেছেন প্রায় ৫০% জন। নিয়মিত আসা নার্সরা রাতে ওয়ার্ডে থাকেন বলেছেন প্রায় ৯১% জন আর নিয়মিত আসা ডাক্তাররা রাতে থাকেন বলেছেন ৫৫% জন। সেবার মান নিয়ে নার্সদের ব্যাপারে সেবাগ্রহীতারা বলেছেন যে, প্রায় ৪৪% জন নার্সদের সেবার মান মোটামুটি সন্তোষজনক আর প্রায় ৪৬% জন ডাক্তারদের ব্যাপারে মোটামুটি সন্তুষ্ট। নার্সদের সেবার মান 'ভাল' বলেছেন প্রায় ২৮% জন আর ডাক্তারদের সেবার মান 'ভাল' বলেছেন প্রায় ৩৯% জন সেবাগ্রহীতা। আর নার্স ও ডাক্তারদের সেবার মান 'খুব ভাল' বলেছেন যথাক্রমে ১০% জন ও ৪% জন।

অবকাঠামো :

স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের জন্য যে অবকাঠামো আছে তা যথেষ্ট নয় বলেছেন শতকরা প্রায় ৫৭.২% জন আর প্রয়োজন অনুযায়ী সিটের ব্যবস্থা নেই বলেছেন শতকরা প্রায় ৬১% জন। শতকরা প্রায় ৬১% জন বলেছেন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা টয়লেট আছে আর এরমধ্যে শতকরা প্রায় ৪০% জন বলেছেন কেন্দ্রে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট আছে।

স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের জন্য যে অবকাঠামো আছে তা যথেষ্ট

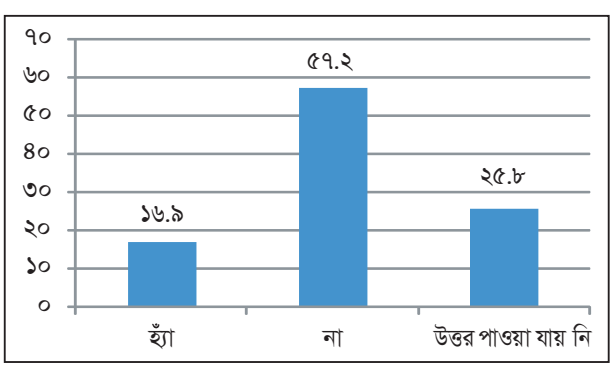

যন্ত্রপাতিঃ

হাসপাতালে/স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যন্ত্রপাতি সমূহ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়

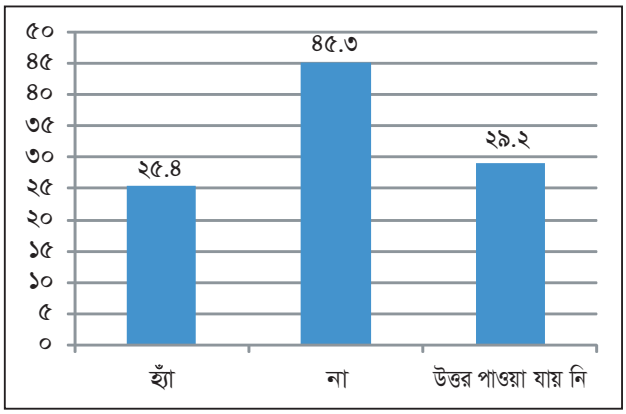

শতকরা মাত্র ১৪% জন বলেছেন যে হাসপাতালে/স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি আছে আর মাত্র ২৫.৪% জন বলেছেন সেগুলো সঠিক ভাবে ব্যবহৃত হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যতটুকু সেবা প্রদানের সুযোগ আছে তা জনগণ যথাযথভাবে পায় না বলেছে প্রায় ৩৬% জন আর না পাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে ডাক্তার কম থাকা (৭২%) উল্লেখ করেছেন, এছাড়াও রয়েছে সব ঔষধ পাওয়া যায় না, ঔষধ বাইরে থেকে কিনতে হয়, ঔষধ বাইরে বিক্রি হয়ে যায়, সেবা দেয়ার মনোভাব নাই ও জনবলের অভাব। আবার হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের জন্য যে জনবল আছে তা যথেষ্ট নয় বলেছেন ৫৩%জন।

কর্তব্যরত ডাক্তারদের তালিকা ও সিটিজেন চার্টারঃ

কর্তব্যরত ডাক্তারদের তালিকা সর্ব সাধারণের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে প্রায় ৩৯.৮% জন সেবাগ্রহীতা। এই প্রতিষ্ঠানে সিটিজেন চার্টার আছে বলেছেন প্রায় ৫৭% জন আর প্রাইভেট সিটিজেন চার্টার আছে বলেছেন প্রায় ৩৫% জন সেবাগ্রহীতা।

কর্তব্যরত ডাক্তারদের তালিকা ও সিটিজেন চার্টার সর্ব সাধারণের জন্য প্রদর্শন করা হয়